প্রাণিসম্পদ ম্যানুয়াল

সম্পাদনায়ঃ

মোঃ সফিকুর রহমান
বিএসসি এ.এইচ (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম)
এম.এস ইন এবিজি (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম)
বিসিএস (প্রাণিসম্পদ)
ম্যানেজার
সরকারী হাঁস মুরগি খামার, রাজবাড়ী

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
www.dls.gov.bd

হাঁস-মুরগী পালন

মডিউল -১

হাঁস-মুরগী পালনের প্রাথমিক নিয়মাবলী ঃ

১.১ <u>অর্থনৈতিক উন্নয়নে হাঁস-মুরগীর ভূমিকা</u> ঃ

বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার যুগে পোল্ট্রি ও পোল্ট্রি শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম । মানুষের প্রধান মৌলিক চাহিদা খাদ্য । খাদ্য হিসাবে পোল্ট্রির ডিম ও মাংস আমিষ সরবরাহে অন্যান্য খাদ্য হতে অধিক গ্রহণযোগ্য ও উপাদেয় । পোল্ট্রিজাত খাদ্য দ্রব্য যেমন দেহে শক্তি যোগায় ঠিক তেমনি দৈহিক বৃদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে । বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ, জনসংখ্যার একটি বড় অংশ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। তাদের মৌলিক চাহিদার খাবার টুকুই জুটে না। তারপর সুষম খাদ্যের কথা তো কল্পনা করাই যায় না। তাদের নানা রকম পুষ্টিহীনতা আছেই। হাঁস-মুরগী পালন করলে এ পুষ্টিহীনতা দূর করে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করা যায় । বর্তমান সময়ে তাই সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে লাভজনকভাবে হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র পরিসরে পারিবারিক পোল্ট্রি উৎপাদন উন্নয়নশীল দেশসমূহের গ্রাম ও শহরতলী এলাকার লোকদের খাদ্য নিরাপত্তা ও দরিদ্রতা নিরসনে যথেষ্ট অবদান রাখে । পোল্ট্রি উৎপাদন পরিবারের বেকার জনগোষ্ঠিকে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে । ফলে দরিদ্র জনগন অর্থ উপার্জন ও সঞ্চয় করতে পারছে, তাদের প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকায় মাংস ও ডিম যোগ হচ্ছে ফলে তারা রোগ-বালাই দ্বারা কম আক্রান্ত হওয়ায় ঔষধ খরচ ও চিকিৎসা খরচ বেঁচে যাচ্ছে । সঞ্চিত অতিরিক্ত অর্থ দরিদ্র জনগন তাদের স্কুলগামী ছেলেমেয়েদের পিছনে ব্যয় করতে পারছে ।

নিম্নে হাঁস-মুরগি পালনের গুরুত্ব সংক্ষেপে বর্ননা দেয়া হলো ঃ

১. স্বল্প ব্যয়ে অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন করা ।
২. স্বল্প মূলধনে পোল্ট্রি ব্যবসা শুরু করা যায় এবং অর্জিত আয় হতে পরিবার প্রতিপালন করা সম্ভব ।
৩. আধুনিক পদ্ধতিতে পোল্ট্রি খামারের জন্য খুব বেশী জমির প্রয়োজন হয় না বিধায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের পক্ষে এ ব্যবসা করা সম্ভব ।
৪. পোল্ট্রি ব্যবসায় অল্প সময়ে অধিক উপার্জন হয় বিধায় দরিদ্রতা নিরসনে এর গুরুত্ব অপরিসীম ।
৫. পোল্ট্রির মলমূত্রে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস প্রচুর পরিমানে বিদ্যমান । জৈব সার হিসাবে পোল্ট্রির মলমূত্র গুরুত্বপূণ । এ ছাড়া পোল্ট্রির মল মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় ।
৬. খামারীগন বন্যা, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতি পোল্ট্রি পালন/ব্যবসার মাধ্যমে পুষিয়ে নিতে পারেন ।
৭. পেল্ট্রি খাদ্য, টীকা, ঔষধ পত্র, ও অন্যান্য উপকরণাদি/সরঞ্জামাদি উৎপাদন ও বাজার জাতকরনের সাথে বহু লোকের কর্মসংস্থান জড়িত ।

পোল্ট্রির সংজ্ঞা, মুরগির বিভিন্ন জাত ও বৈশিষ্ট্য ঃ

আধুনিক পোল্ট্রির সংজ্ঞা অনেক ব্যাপক। সাধারনতঃ আমারা যেসব পাখি বানিজ্যিক বা সখের উদ্দেশ্যে নিয়ে বাসায় বা ঘরে পুষে থাকি, তাদের সবাইকে নিয়েই পোল্ট্রির সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। মুরগি, হাঁস,কবুতর টার্কি, কোয়েল ,কাকতুয়া ইত্যাদি পোল্ট্রির অর্ন্তভুক্ত । মোরগ মুরগির জাত তাদের উৎপত্তিস্থান ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী করা হয়েছে। যেমন

ক) আমেরিকান জাত

বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ -

পায়ের নালা পালকবিহীন

কানের লতি লাল রংয়ের

ডিম উৎপাদন ও মাংস উৎপাদন মধ্যম

আকার মাঝারি

গায়ের চামড়া হলুদ

ডিমের রং বাদামী

কয়েকটি জাতের নাম ঃ

পস্নাইমাউথ রক (Plymouth Rock)

রোড আইল্যান্ড রেড (Rhode Island Red)

ইংলিশ জাত

বৈশিষ্ট্য

- কানের লতি লাল
- ডিম ও গোস্ত উৎপাদন মধ্যম ধরনের
- গায়ের চামড়ার রং হলুদ
- আকার মাঝারি ৩½- ৪ কেজি
- ডিমের রং বাদামী

কয়েকটি জাত

- অষ্ট্রালরপ(Australorp)
- সাসেক্স (Sussex)

ভূ-মধ্য সাগরীয় অঞ্চলের জাত

বৈশিষ্ট্য

- কানের লতি সাদা
- ডিম ও গোস্ত উৎপাদন খুব ভাল
- গায়ের চামড়ার রং সাদা
- আকার মাঝারি ছোট
- ডিমের রং সাদা
- উৎপাদন ক্ষমতা বেশী।

কয়েকটি জাত

- হোয়াইট লেগহর্ন
- মাইনোরকা

এশিয়াটিক ক্লাস

কোন স্বীকৃত জাত নেই তবু যে গুলোকে অমরা জাত বলে থাকি তাদের বৈশিষ্ট্য হলঃ

- পায়ের নালায় পালক থাকতে পারে
- গায়ের চামড়া হলুদ
- কানের লতি লাল
- আকারে বেশ বড়
- ডিমের খোসার রং বাদামী

কয়েকটি জাত

আসিল (Asel)

কোচিন(Cochin)

বর্তমানে অনেক শংকর জাত বের হয়েছে তাদের নাম ,

লেয়ার -

লোহম্যান হোয়াইট/ব্রাউন, ইসা ব্রাউন, ব্যাবকক, বিবি -৩০০, ব্যাবলোনা হারকো, ব্যাবলোনা টেট্রা,হাবার্ড ব্রাউন,বোভান্স নেরা, ইসা ব্রাউন, ষ্টারক্রস ব্রাউন, হাইসেক্স ব্রাউন, সেভার ব্রাউন, ইসারোজ,গোল্ড লাইন।

ব্রয়লার

সেভারষ্টার ব্রো, সেভার মাষ্টার, ভেনকব, ইসা ভেডেট, ইসা আই ৭৫৭, ইসা এসপিকে, লোহম্যান মিট, রস-১০০, হাইব্রো , হাবার্ড ক্লাসিক।

১.২ হাঁসের জাত ও বৈশিষ্ট্য ঃ

পিকিং

উৎপত্তিস্থান চীন

গায়ের রং সাদা

ডিমের জন্য ভালো

গড়ে ১৫০- ১৬০ টি ডিম দেয়।

ওজন ৪ - ৪.৫ কেজি

মাসকোভি

আকারে বড়, মাংসের জন্য ব্যবহার করা হয়।

ওজন ৬ - ৭ কেজি হয়।

ডিম উৎপাদন ৮০ -১০০টি ।

ইন্ডিয়ান রানার

উৎপত্তি স্থান ভারত হলেও পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যায়। সাদা রংয়ের হাঁস। ওজন ১.৫ - ২ কেজি।

আরও উন্নত শংকর জাতের হাঁস আছে। ভিয়েতনামের চেরীভ্যালি জাত ডিম ও মাংসের জন্য পৃথক ভাবে উদ্ভাবন করা হয়েছে।

মডিউল -২

হাঁস-মুরগির বাসস্থান ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

২.১ মুরগির বাসস্থানের প্রকৃতি এবং ব্যবহৃত উপকরন ও সরঞ্জামাদি ঃ

মুরগি থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ মাংস এবং ডিম উৎপাদন পেতে হলে তাদের জন্য আরামদায়ক উপযুক্ত পরিবেশ ও আভ্যন্তরীন ও বহি:রস্থ সর্ব প্রকার শত্রুর আক্রমন হতে রক্ষা করার উপযোগী বাসস্থান প্রয়োজন হয়।

বাসস্থানের প্রকৃতিঃ

মুরগীর ঘর এমন ভাবে তৈরী করতে হয় যেন ঘরের ভিতর অনুকূল পরিবেশ বজায় থাকে।

যেমন ঃ

- ঘরের ভিতর উৎপাদিত বিষাক্ত গ্যাস অপসারিত হয় ;
- ঘরে ব্যবহৃত লিটার আর্দ্রতামুক্ত থাকে;
- ঘরের ভিতর পর্যাপ্ত পরিমান বিশুদ্ধ বাতাস চলাচল করতে পারে;
- এক ঘর হতে অন্য ঘরের মধ্যে জীবাণু সংক্রমণ না হতে পারে;
  সমস্ত প্রকার প্রতিকুল আবহাওয়া ও পারিপার্শিক পরিবেশ থেকে মুরগী রক্ষা পায়।

মুরগির জন্য অনুকূল পরিবেশঃ

দৈহিক তাপমাত্রা

মুরগির জাত ,বয়স ,লিঙ্গ এবং উপযোগীতা অনুসারে এই তাপ ভিন্ন ভিন্ন হয় ঃ

যেমন-

- সদ্য উৎপাদিত বাচ্চা ১০৩ফা. (৩৯.৪সে:)
- ৩ সপ্তাহ বয়সে ১০৫ফা: (৪০.৬ সে:)
- পূর্ণ বয়সে ১০৭ফা: (৪১.৭ সে)
- হাল্কা জাতের মুরগির তুলনায় ভারী জাতের মুরগির দৈহিক তাপ কম;
- মুরগির তুলনায় মোরগের দৈহিক তাপ বেশী
- ব্রয়লার মুরগির দৈহিক তাপ কম
- মোলটিং সময়ে দৈহিক তাপ বৃদ্ধি পায় ।

এরুপ আবহাওয়া, অদ্রতা, বিষাক্ত গ্যাস, রোগজীবানুর বিস্তার সম্পর্কে বিভিন্ন কৌশলগত দিকগুলো লক্ষ্য রাখতে হবে।

মুরগির ঘরের প্রকৃতিঃ

মুরগির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ প্রকার ঘর ব্যবহার করা হয় ।

যেমন-

(ক) উন্মুক্ত ঘর

(খ) পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘর

(গ) হাইরাইজ ঘর

(ক) উন্মুক্ত ঘর

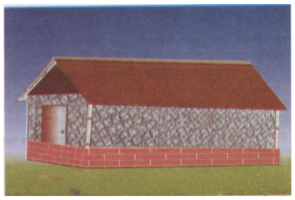

চিত্র-১ উন্মুক্ত ঘর

চিত্র নং - ২ উন্মুক্ত ঘর

চিত্র নং -২ বহুতল বিশিষ্ট

- এই ঘর প্রাকৃতিক আলো বাতাস চলাচলের জন্য চারদিকে অথবা উত্তর দক্ষিণে উন্মুক্ত রাখা হয়।
- এই প্রকৃতির ঘর পূর্ব পশ্চিমে লম্বালম্বি ভাবে স্থাপন করা হয়।
- উন্মুক্ত ঘর নিমার্ন খরচ কম।
- প্রাণিপাখির প্রবেশ ও আক্রমন হতে রক্ষার জন্য উন্মুক্ত স্থান তারের জাল দিযে ঘিরে বেড়া দিতে হয়।
- ঘরের ভিতর লিটার অথবা মাঁচা ব্যবহার করা যায়।
- এই প্রকৃতির ঘর সর্বাধিক ৩০ ফুটের (৯.০ মিটার)বেশী প্রশস্ত হলে ভেন্টিলেশন সমস্যা হয়।
- ঘরের লিটার ব্যবহার করলে খোলা স্থানের নিচের অংশ ১ হতে ১.৫ ফুট (৩০-৪৫ সে.মি.)উচুঁ দেয়াল থাকে মাঁচা বা খাঁচা ব্যবহার করলে কোন দেয়াল থাকে না।
- দোচালা ঘরের চালের ছাচ ৮ ফুট (২.৪ মিটার) এবং উভয় চালের শীর্ষ দেশ ১৪ ফুট(৪.২ মিটার) উচূঁ হয় । ছোট ঘর হলে ছাচ ৬ ফুট এবং শীর্ষদেশ ১২.০ ফুট হতে পারে।
- বৃষ্টির ছাট ঘরে প্রবেশ বন্ধ করার জন্য চালের ছাট ২.৫ হতে ৪ ফুট বাড়তি রাখা হয়।
- কংক্রিট ছাট হলে বহুতল ঘর নির্মাণ করা যায়।
- ঘরের দৈর্ঘ্য ইচ্চামত লম্বা করা যায়।
- ঘরে স্বংয়ক্রিয় খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা থাকলে সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক্রমে ঘরের দৈর্ঘ্য তৈরী করতে হয়।
- ঘরে বাতাস চলাচলের গতি সঞ্চারের জন্য বাতাসের অনুকূলে বেস্নায়ার বা প্যাডেস্টাল ফ্যান ব্যবহার করা হয়।
- খামারের একাধিক শেড থাকলে পরস্পর শেডের দূরত্ব কমপক্ষে শেডের প্রস্থের ১.৫ গুণ হওয়া প্রয়োজন।
- ঘরের মেঝে ইঁদুর প্রতিরোধক হওয়া উচিত।

(খ) পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘর

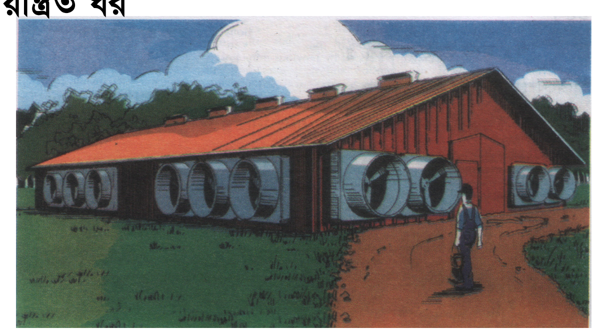

চিত্র নং ৪ পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘর

মুরগির বয়স ও উপযোগিতা অনুসারে ঘরে তাপ আর্দ্রতা ও আলোক নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

- ঘরে কৃত্রিম ভেন্টিলেশণ ব্যবস্থারের কারনে ইচ্ছেমত ঘরের প্রশস্ততা ও দৈর্ঘ নির্মাণ করা যায় ।
- পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘরে খাদ্য ও পানি প্রদান যান্ত্রিক পদ্ধতিতে করা সহজ।
- এই ঘরে পালিত মুরগির মধ্যে রোগ বিস্তারের সম্ভাবনা কম , ফলে মৃত্যু হারও কম ।
- মুরগি অনেক বেশী উৎপাদশীল হয়।
- খাদ্য রূপান্তর হার অনেক বেশি হয় ।
- মুরগি অত্যাধিক আরাম ও স্বাচছন্দ্য বোধ করে।
- খামারে কম দূরত্বে একাধিক শেড নির্মাণ করা যায় । তবে ঘরের ভিতর থেকে দূষিত বাতাস নির্গমন পথ বরাবর কোন শেড নির্মাণ করা উচিত নয় ।

পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘরের সমস্যা

- প্রাথমিক নির্মাণ খরচ বেশি।
- যান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি নির্ভরশীল থাকতে হয়।
- কোন কারণে ১৫মিনিট বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকলে মুরগি মারা যায়।

(গ) হাইরাইজ ঘর

চিত্র নং ৫ হাইরাইজ ঘর

- এই ঘর দ্বিতল বিশিষ্ট হয় । উপরের তলায় মুরগি থাকে এবং নীচ তলায় মুরগির পরিত্যক্ত মল জমা হয়।
- প্রতি তলার উচ্চতা ৭ ফুট হিসেবে মোট ১৪ ফুট উঁচু হয়।
- নীচ তলায় বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে যাতে মল ভিজে না যায় তার জন্য নীচতলার মেঝে ১ ফুট উঁচু তৈরী দেয়াল করা হয়।
- এই ঘর উন্মুক্ত অথবা পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।
- প্রতি ব্যাচ মুরগি পালন অথবা একাধারে ৫-৬ বৎসর মুরগি পালন শেষে নীচে জমে থাকা মল পরিষ্কার করা যায়।
- উন্নত ভেন্টিলেশন ব্যবস্থার কারণে পরিত্যক্ত মল দ্রুত শুকায়, ফলে দুর্গন্ধ হয় না।
- ঘনঘন মল পরিষ্কার করার প্রয়োজন না থাকায় শ্রমের সাশ্রয় হয়।
- এই ঘরে মাঁচা পদ্ধতিতে মুরগি পালন সহজ।

হাইরাইজার ঘরের অসুবিধা ঃ

- প্রাথমিক নিমার্ণ খরচ বেশী
- লিটার পদ্ধতিতে মুরগি পালন করা যায় না।

খামারে ব্যবহৃত উপকরণ ও সরঞ্জাম

(১) ব্রুডার : ব্রুডারের ৩টি অংশ যেমন
ক) হোভার , খ) ব্রুডার হিটার গ) ব্রুডার গার্ড

(২) পানির পাত্র ঃ

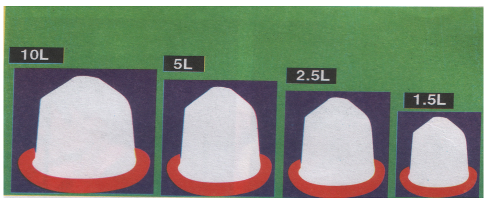

চিত্র নং ৬ ঝর্না ড্রিংকার

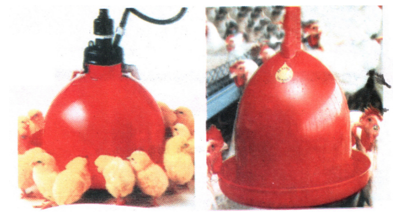
চিত্র নং ৭ বেল টাইপ ড্রিংকার

ছোট বাচ্চা ,বাড়ন্ত বাচ্চা ও বিভিন্ন বয়সের মুরগির জন্য আজকাল বিভিন্ন প্রকার পানির পাত্র পাওয়া যায়। যেমন-
ক) ঝর্না ড্রিংকার খ) নিপল ড্রিংকার গ) কাপ ড্রিংকার ঘ) বেলটাইপ ড্রিংকার ঙ) ট্রাফ ড্রিংকার

(৩) খাবার পাত্র ঃ

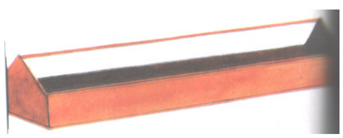
চিত্র নং ৮ প্লাষ্টিকের তৈরী ট্রাফ ফিডার

চিত্র নং ৯ প্লাষ্টিকের তৈরী টিউব ফিডার

ক) প্রথম খাবার পাত্র-কাগজ/চিকবাক্সের ঢাকনি /পস্নাষ্টিক ট্রে /থালা ইত্যাদি
খ) দ্বিতীয় খাবার পাত্র প্লাষ্টিক বা কাঠের তৈরী ট্রাফ ফিডার, গ্রীল সংযুক্ত ট্রাফ ফিডার, পাষ্টিকের তৈরী টিউব ফিডার , স্বংক্রিয় ফিডার

৪) মুরগি ধরার জন্য (ক্যাচিং) হুক

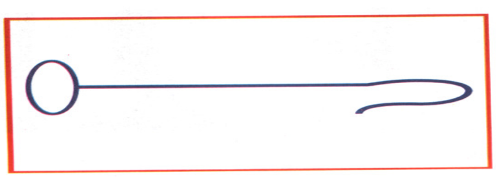
চিত্র নং ১০ মুরগী ধরার জন্য হুক

ক্যাচিং হুক মুরগির পায়ে আটকে মুরগি ধরা হয় । ১৪ গেজ তারের সাহায্যে এ হুক তৈরী করা যায় ।

(৫) মুরগি ধরার হার্ডল ঃ

- হার্ডল স্থানান্তর যোগ্য এক ধরনের বেড়া
- হর্াডলের সাহায্যে মুরগি একত্রে জমা করে ধরা হয়।
- হার্ডলের গায়ে দরজা থাকে। দরজার ভিতর হাত ঢুকিয়ে জমা করা মুরগি ধরতে সুবিধা হয়।

- হার্ডল সাধারণত : পাষ্টিকের সাহায্যে তৈরী করা হয়া।
- একাধিক হার্ডল পরস্পর সংযুক্ত করে প্রয়োজনমত বড় করা যায়।
- হার্ডলের আকার ৪ ফুট - ৫ ফুট অথবা সুবিধামত মাপের পাওয়া যায়।
- মুরগির প্রতিশেধক টীকা, বাছাই ও বাজারজাত করার জন্য মুরগি ধরতে হার্ডল ব্যবহার করা হয় ।

২.২ মুরগি পালন পদ্ধতি

ক) লিটার পদ্ধতি, খ) মাঁচা পদ্ধতি গ) মাঁচা ও লিটার পদ্ধতি ঘ) খাঁচা পদ্ধতি

২.৩ ক) লিটার পদ্ধতি

চিত্র-১১ লিটার পদ্ধতিতে মুরগী পালন

লিটার পদ্ধতিতে শুকনা ও দুর্গন্ধ মুক্ত তুষ, কাঠের গুড়া, খড় ও অন্যান্য অপ্রচলিত জিনিস লিটার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। লিটার ব্যবস্থায় দুইভাবে লিটার ব্যবহার করা যায়। যথা ঃ হালকা লিটার ও ডিপ লিটার ব্যবস্থা ।

লিটার পদ্ধতির উপকারিতা ঃ

*ঘর শুকনা ও দুর্গন্ধমুক্ত থাকে।

*লিটার ব্যবহার করলে মেঝেতে পায়খানা লেপ্টে যায় না।

* মুরগির জন্য আরমদায়ক ও স্বাস্থ্যকর বিছানা তৈরী হয়।

*খাদ্য রুপান্তর হার বেশী হয়।

* লিটারের মধ্যে এক প্রকার ভিটামিন ও্র আমিষ জাতীয় খাদ্য উপাদান তৈরী হয়।

* ডিমের মধ্যে রক্তকণিকা হয় না।

* ডিম পাড়া শেষে বাতিল মুরগির ওজন বেশী থাকে এবং বিক্রয় মূল্য বেশি হয়।

* লিটারের মুরগি পালন সহজ।

* ব্যবহৃত লিটার উন্নতমানের জৈব সার এবং মাছও প্রাণিপাখির খাদ্য হিসাবে ব্যবহার কার যায়।

লিটার পদ্ধতিতে মেঝের স্থান

(ক) ১ দিন হতে ৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত

মুরগির জাত	লিটার পদ্ধতি		মাঁচা বা স্লাট পদ্ধতি		খাঁচা পদ্ধতি	
	বর্গ ফুট	বর্গমিটারি	বর্গ ফুট	বর্গমিটারি	বর্গইঞ্চি	বর্গ সে.মি:
সাদা জাত	০.৭৫	০.৭০	০.৬০	০.০৫৬	১৮	১১৬
রঙ্গিন জাত	০.৮৫	০.০৭৮	০.৭৫	০.০৭০	২০	১২৯
ব্রয়লার জাত	১.০০	০.০৯২৯	০.৮৬	০.০৮০		

(খ) ৭ সপ্তাহ বয়স থেকে ১৮ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত

মুরগির জাত	লিটার পদ্ধতি		মাঁচা বা স্লাট পদ্ধতি		খাঁচা পদ্ধতি	
	বর্গ ফুট	বর্গমিটারি	বর্গ ফুট	বর্গমিটারি	বর্গইঞ্চি	বর্গ সে.মি:
সাদা জাত	১.০০	০. ০৯২৯	০.৮৬	০.০৮	৪৫	২৯০
রঙ্গিন জাত	১.২০	০.১১	১.০০	০. ০৯২৯	৫৪	৩৪৮

(গ) ১৮ সপ্তাহের উর্দ্ধে

মুরগির জাত	লিটার পদ্ধতি		মাঁচা বা স্লাট পদ্ধতি		খাঁচা পদ্ধতি	
	বর্গ ফুট	বর্গমিটারি	বর্গ ফুট	বর্গমিটারি	বর্গইঞ্চি	বর্গ সে.মি:
সাদা জাত	১.৫০	০.১৪	১.২৫	০.১১	৬৫"-৭০"	৪১৯-৪৫১
রঙ্গিন জাত	১.৭৫	০.১৬	১.৫০	০.১৪	৭০"-৭৫"	৪৫১-৪৮৪

মাঁচা বা স্লাট পদ্ধতির উপকারিতা

* মাঁচার ফাঁক দিয়ে পায়খানা নীচে পড়লে পিরিস্কার করতে সুবিধা হয়।
* রোগ বিস্তারের সম্ভবনা কম
* মাঁচার উপর স্বাস্থ্যকর অবস্থা বজায় থাকে
* মাঁচার উপর মুরগির স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে
* ডিম পরিষ্কার থাকে।
* তুলনামূলকভাবে লিটার পদ্ধতির চেয়ে মুরগিপ্রতি কম স্থানের প্রয়োজনস হয়।

স্লাট **বা মাঁচা পদ্ধতির সমস্যা**

চিত্র-১২ স্লাট **বা মাঁচা পদ্ধতিতে মুরগি পালন**

* মাছির উপদ্রব হয় * দুর্গন্ধ হয় * স্লাটের উপর ডিম ভাংগার সম্ভবনা বেশী।
* মুরগির প্রতি খাদ্য রূপান্তর হার কম। * স্লাট নির্মাণ খরচ বেশী। * স্লাটের /মাঁচার নীচ দিয়ে শীতের সময় ঠান্ডা বাতাস ঢুকলে ক্ষতি হয়।

২.৪ স্লাট কাম লিটার পদ্ধতির বিবরন

চিত্র-১৩ স্লাট কাম লিটার পদ্ধতিতে মুরগি পালন

ঘরের ভিতর ২ ভাগ স্লাট এবংয় ১ ভাগ লিটার ব্যবহার করা হয় উন্মুক্ত ঘরে উভয় দিকের নেট ঘেঁষে এবং পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘরের মধ্য বরাবর সাধারণত : স্স্লাট মাঁচা স্থাপন করা হয়। বৃষ্টির দিনে উন্মুক্ত ঘরে স্স্লাটের উপর বৃষ্টির ছাট পড়লে তেমন ক্ষতি হয় না । স্স্লাটের উপর পানি ও খাবার পাত্র স্থাপন করা হয়॥   ডিম পাড়ার বাসা ৫০ ভাগ লিটারের উপর এবং ৫০ ভাগ স্স্লাটের উপর থাকে। স্স্লাটের উপরিভাগ লিটার মেঝে হতে ২৭ ” উঁচু হয়। স্স্লাটের নীচে তারের জাল দ্বারা ঘেরা থাকে এবং জালের ফাঁকে দিয়ে বাতাস ঢুকে মুরগির জমাকৃত পায়খানা শুকায়, ফলে গন্ধ হয় না । প্রয়োজন মত স্স্লাটের নীচ হতে পায়খানা পরিষ্কার করা হয়। শীতের সময় স্স্লাটের ফাঁক দিয়ে ঠান্ডা বাতাস প্রবেশ বন্ধ করার জন্য অপসারণযোগ্য পস্নাষ্টিক পর্দা দ্বারা তারের জালের উপর ঢেকে দেয়া হয়।

স্লাট-কাম লিটার ঘরের উপকারিতা

এই ঘরে দুর্গন্ধ খুব কম হয়

এই ঘরে ব্রিডার মুরগি পালন করলে লিটারের উপর মিলন হয়।

পানি পড়ে লিটার ভিজার সম্ভাবনা থাকে না ।

স্স্লাট-কাম লিটার পদ্ধতির অসুবিধা

নির্মান খরচ বেশি

মাছির উপদ্রব কিছুটা হয়

খাঁচার তুলনায় মুরগি প্রতি বেশি স্থান প্রয়োজন।

এই পদ্ধতি ব্রিডার মুরগির জন্য বেশি উপযোগী।

ঘ) খাঁচা পদ্ধতি

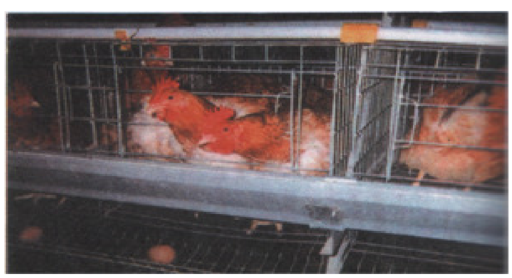

চিত্র-১৪ খাচা পদ্ধতিতে মুরগি পালন।

খাঁচার মধ্যে বাচ্চা ব্রুডিং থেকে শুরু করে লেয়ার মুরগি পালন বর্তমানে অনেক বেশী জনপ্রিয়। সারা বিশ্বে শতকরা ৭৫ ভাগ মুরগি খাঁচা পদ্ধতিতে পালন করা হয়।

খাঁচা পদ্ধতির উপকারিতা

* পরিচর্যা সহজ
* রোগ বিস্তারের সম্ভাবনা কম
* সহজে ডিম সংগ্রহ করা যায়
* ডিমের গায়ে ময়লা লাগে না
* মুরগি প্রতি অনেক কম স্থানের প্রয়োজন হয়
* কৃমির আক্রমণ সম্ভাবনা কম।
* অসুস্থ মুরগি সহজে চিহ্নিত করা যায়।
* অনুৎপাদনশীল মুরগি বাছাই সহজ

২.৫ হাঁসের বাসস্থান ও তার প্রকার ভেদ

গৃহপালিত পাখিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে রক্ষা করে আরাম ও নিরাপদ স্থানে বাসস্থান দেয়াই গৃহস্বামীর লক্ষ্য । হাঁস খুব বেশী গরম ও খুব বেশী ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না । হাঁসের ঘর নির্মাণ করতে গিয়ে বেশী খারচ না করে সীমিত খরচের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিৎ । আবার বাসস্থান নির্মাণ করতে গিয়ে এমন নড়বরে ঘর রাখা উচিৎ নয় যাতে শিয়াল, বাউরাল ,নেউল, চিকা ,ইদুর ইত্যাদি হাঁস ও হাঁসের বাচ্চার ঘরে প্রবেশ করে ক্ষতি করতে পারে। হাঁসের ঘর নির্মাণের প্রাক্কালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার ।

১। জায়গা নির্বাচণ ঃ হাঁসের ঘরের জন্য সাধারণত: খোলা ,উচু ও রৌদ্র থাকে এমন জায়গা বাছাই করা উচিৎ । বালু মাটি, ড্রেন কাটার সুবিধা আছে এবং ঘাস জম্মাতে না পারে এমন জায়গা নির্বাচন করা উত্তম। ঘরের সংগে বড় গাছ বা জংগল থাকা উচিত নয়। মুরগীর খামারের সন্নিকটে হাঁসের ঘরের জায়গা নির্বাচন করা ঠিক নয়।

২। ঘরের নমুনা ঃ

কি নমুনার ঘর ,কত হাঁস পালন করা হবে ইত্যাদি চিন্তা ভাবনা করে ঘর তৈরী করতে হবে। অল্প হাঁসের জন্য ছোট ঘর এবং বেশী হাঁসের জন্য বড় স্থায়ী ঘর তৈরী করাই ভাল । লম্বা, সরু এবং চারকোণা ঘর তৈরী করা উচিত। গ্রামীন পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পারিপাশিক অবস্থার বিষয় চিন্তা ভাবনা করে ঘরের চালা নির্বাচন করতে হবে।

১। সেড টাইপ ২। গেবল টাইপ ৩। সেমি গেবল টাইপ ৪। মনিটর টাইপ ৫। সেমি মনিটর টাইপ ৬। গোল টাইপ।

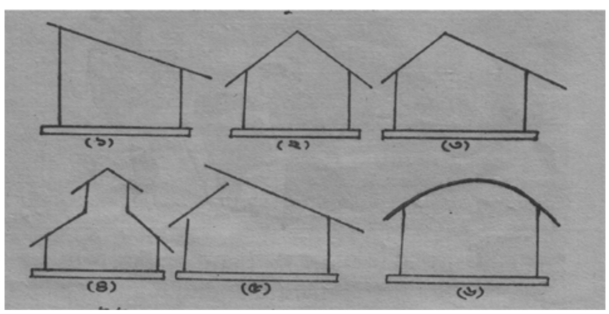

চিত্র-১৫ হাঁসের ঘরের বিভিন্ন নমুনা

ঘরের ব্যবস্থাপনা ঃ

১। তাপ ঃ ঘরের তাপ নিম্ন ৪.৪ ডিগ্রী সেঃ উর্দ্ধে ৩৭.৮ ডিগ্রী সেঃ হাঁস মুরগির জন্য মারাত্মক । ঘরের তাপ সাধারনত ১২.৮ ডিগ্রী সেঃ থেকে ২৩.৯ ডিগ্রী সেঃ পর্যন্ত উত্তম।

২। আর্দ্রতাঃ আবহাওয়া ভাল থাকলে হাঁসের শারীরিক বৃদ্ধি, লোম গজানো এবং ডিমের উৎপাদন ভাল হয় । তাছাড়া অপ্রাকৃতিক পরিবেশ ডিম উৎপাদনে ক্ষতি করে। হাঁস সাধারণত ৭০% আর্দ্রতা সহ্য করতে পারে। শতকরা ৩০% কমে পাখনা ঝরে যায়। ঘরের আদ্রতা ৭০% এর উর্দ্ধে হলে ককসিডিয়া ও কৃমির উৎপাত বাড়ে এবং হাঁসকে অস্থির অবস্থায় দেখা যায়। প্রতিকারের একমাত্র উপায় ঘরের লিটার শুকনা রাখা এবং বায়ূ চলাচলে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা।

(৩) আলো (কৃত্রিম) ঃ কৃত্রিম আলো সাধারণত : হাঁস-মুরগীর দৈহিক বৃদ্ধি, রতিক্রিয়া এবং ডিম উৎপাদনে সহায়তা করে । হাঁসের বাচ্চার অন্তত ৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত রাতে আলোর ব্যবস্থা রাখা বাঞ্ছনীয়। এতে খাদ্য বেশি খাবে এবং দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পাবে। ডিম দেয়া হাঁসের জন্য ১৪-১৬ ঘন্টা

আলো সরবরাহ উত্তম। এই অতিরিক্ত সময় কৃত্রিম আলো সকাল অথবা বিকালে যোগ করে অথবা উভয় সময় ভাগ করে দিলেই চলবে। ৩০০ বর্গফুট জায়গার জন্য ১টি ৬০ ওয়াট বাল্ব যথেষ্ট । ব্রয়লার হাঁস ও মুরগীর জন্য সারা রাত্রি আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(৪) মেঝে এবং মেঝের পরিমাপ ঃ মেঝে স্যাঁতস্যাঁতে না হয় এবং ইঁদুর প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ৭-৮ সপ্তাহ পর্যন্ত বাচ্চার জন্য তারের জালের মেঝে এবং বয়স্ক হাঁসের জন্য পাকা মেঝে বাঞ্ছনীয়। মেঝের পরিমাপ বাচ্চা ও বয়স্ক হাঁস পালন অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য ।

(৫) বাতাস চলাচল ব্যবস্থা (ভেনটিলেশন)ঃ দেয়ালের শতকরা ৪০ ভাগ হিসেবে ঘরের লম্বালম্বি বেড়ার তারের জালের ব্যবস্থা বা বাঁশের সাহায্যে ছিদ্র ওয়ালা বেড়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(৬) লিটার (বিছানা) আর্দ্রতা শোষণ করতে পারে এমন বস্তু লিটার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে । ধানের খড় বা গমের টুকরা , ধানের তুষ, কাঠের গুড়া ইত্যাদি লিটার হিসাবে ব্যবহার করা যায় । লিটার সর্বদা শুকনা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। ধানের তুষ বা কাঠের গুড়া ব্যবহার করলে উঁচু লিটার (৩ ” - ৪ ”) ব্যবহার না করে পাতলা লিটার (১ ”-২ ”) ব্যবহার করতে হবে।

(৭) খাবার ও পানির পাত্র ঃ বাচ্চা ও বয়স্ক হাঁস পালন অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

মডিউল -৩
বাচ্চা পালন

৩.১। ব্রুডিং ও ব্রুডিং কর্মসূচী ঃ

অল্প বয়সে পালক না হওয়ায় বা ছোট থাকায় শরীর আবৃত্ত হয়না এ জন্য শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রনের জন্য কৃত্রিম তাপের প্রয়োজন হয়। এ অবস্থায় কৃত্রিম ভাবে তাপ দেয়াকে ব্রুডিং বলা হয় । ব্রুডিং দুই ভাবে করা যায় । যথাঃ -ক) প্রাকৃতিক ব্রুডিং ও খ) কৃত্রিম ব্রুডিং

ক) প্রাকৃতিক ব্রুডিং ঃ মুরগির সাহায্যে প্রাকৃতিক ব্রুডিং করা হয়।

খ) কৃত্রিম ব্রুডিং ঃ বৈদ্যুতিক, গ্যাস, কেরসিন ও অন্যান্য তাপের উৎসের মাধ্যমে ব্রুডিং করাকে কৃত্রিম ব্রুডিং বলে।

বাচ্চা ব্রুডিং ঘর ঃ

খামারের লেয়ার বাচ্চা পালন করার জন্য তিন প্রকার ঘরের ব্যবহার করা হয় । যেমনঃ

ক) ব্রুডার হাউজ খ) ব্রুডার-কাম -গ্রোয়ার হাউজ গ) ব্রুডার -কাম- লেয়ার হাউজ।

ব্রুডার **হাউজ ঃ**

* স্বতন্ত্র ব্রুডার ঘরের আকার ছোট হওয়াতে তাপ উৎপাদন খরচ কম।

* এই ঘরে বাচ্চা ব্রুডিং শেষে বাচ্চাগুলোকে বিক্রি বা গ্রোয়ার হাউজে স্থানান্তর করা হয়।

* এই সময়ে বাচ্চা স্থানান্তর করলে বাচ্চার ধকল হয় ও রোগ বিস্তারের সম্ভাবনা বারে।

ব্রুডার ঘর কাম- গ্রোয়ার হাউজঃ

- বর্তমানে এই ঘরের প্রচলন বেশী । ঘরের মধ্যে কিছু পরিমান স্থান পৃথক ভাবে ব্রুডিংয়ের ব্যবস্থা করা যায় এমন ভাবে তৈরী করা হয়। পরে গ্রোয়িং অবস্থায়ও সেখানেই রাখা হয়।
- বাচ্চা বড় হওয়ার সাথে সাথে স্থানের প্রয়োজন বেশি হতে থাকলে পর্দা শরিয়ে বাচ্চা থাকার স্থান প্রশস্ত করা হয়।
- লেয়ার ঘরে স্থানান্তরের পুর্ব পর্যন্ত এ ঘরে পুলেট পালন করা হয়।

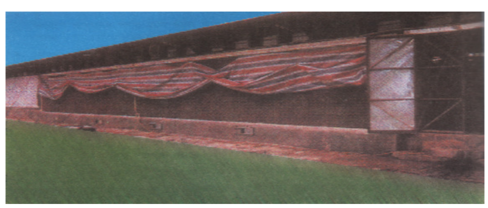

চিত্র-১৬ **ব্রুডার ঘর কাম- গ্রোয়ার হাউজ**

ব্রুডার -কাম- লেয়ার হাউজ ঃ

- এই ঘরে বাচ্চা পালন ও বাড়ন্ত বাচ্চা পালন শেষে ডিম পাড়া পর্যন্ত মুরগি পালন করা হয়।

প্রতি ব্যাচ বাচ্চা পালন করার জন্য বাচ্চার সংখ্যা নির্ধারনঃ

- খামারের প্রয়োজন ও ঘরের ধারন ক্ষমতানুসারে প্রতি ব্যাচে বাচ্চা পালন করার জন্য বাচ্চার সংখ্যা নির্ধারন করতে হয়।
- বাণিজ্যিক খামারে ব্রুডার - কাম- গ্রোয়ার হাউজে পুলেট প্রতি গড়ে এক বর্গফুট স্থান হিসাবে বাচ্চার সংখ্যা নির্ধারন করা হয়।

- ৪ফুট ব্যাসের হোভারের নীচে সাদা বাচ্চা ৫০০টি রঙ্গিন বাচচা ৪৭৫ টি এবং বয়লার বাচ্চা ৪৫০টি ব্রুডিং করা হয়। এই হিসেবে ঘরে ব্রুডারের সংখ্যা নির্ধারন করা হয়।
- ঘরের আয়তন ও বাচ্চার সংখ্যানুসারে ঘরে ব্রুডার স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়।
- সকল সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত শতকরা ৫টি বাচ্চা বেশী পালন করা হয়।

৩.২ ব্রুডিং পুর্ব প্রস্তুতি, বাচ্চা ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা

ব্রুডার ঘর প্রস্তুত

- ব্রুডার ঘর /ব্রুডার - কাম গ্রোয়ার ঘর খালি হওয়ার সাথে সাথে ঘরের সম্স্ত সরঞ্জাম , লিটার /ব্রুটিং খাচা ইত্যাদি বের করতে হয়।
- ঘরের কোন সংস্কার প্রয়োজন হলে ব্যবস্থা নিতে হয়।
- ঘরের মেঝেতে লেগে থাকা ময়লা পানি দিয়ে ভিজিয়ে তুলে ফেলতে হয়।
- পরিষ্কাতর পানি দ্বারা সমস্ত ঘর ধুয়ে ফেলতে হয়।
- ভেন্টিলেশন ,ফ্যান, লাইট ,দরজা জানালা ঝেড়ে মুছে পরিস্কার করতে হয়।

ঘর জীবানুমুক্ত করনঃ

- জীবানুণাশক ব্যবহৃত পানিতে ব্রাশ ভিজিয়ে ভেন্টিলেশন ,ফ্যান, লাইট ,দরজা জানালা ঝেড়ে মুছে পরিস্কার করতে হয়।
- ঘরের মেঝেতে আইয়োসান / ফিনাইল/স্যাবলন/ডেটল ইত্যাদি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হয়।
- অথবা অল্প খরচের জন্য ভিজা ঘরে মেঝের উপর প্রতি ১০০বর্গ ফুট স্থানে এক কেজি কাপড় কাচা সোডা ভালভাবে ছড়িয়ে ১৫ মিনিট পরে ভালভাবে ধুয়ে ফেলতে হয়।
- ঘর পরিস্কার করার সময় ও জীবানুনাশক ব্যবহারে সময় পায়ে গাম্বুট,দেহে এপ্রোন ও মুখে মুখোশ ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় ।

ঘরে লিটার / খাঁচা ও সরঞ্জামাদি স্থাপন

- ঘর জীবানুমুক্ত হওয়ার পর ভালভাবে শুকাতে হবে (১০-১৫ দিন) ।
- শকনা মেঝের উপর ২” পুরোকরে লিটার সামগ্রী বিছানোর পর ব্রুডার গার্ড, হোভার, হিটার ইত্যাদি পর্যাক্রমে স্থাপন করতে হয়।
- ব্রুডার গার্ডের একফুট ভিতরে ড্রিংকার ও খাদ্য পাত্র স্থাপনের জন্য স্থান রাখতে হয়।
- খাঁচায় ব্রুডিং করলে লিটারের পরিবর্তে ব্রুডার খাঁচা স্থাপন করা হয়।
- ব্রুডার -কাম-গ্রোয়ার হাউজের উন্মুক্ত স্থান পর্দা দ্বারা ঢেকে দিতে হয়। গরমকালে চটের পর্দা এবং শীত ও বর্ষার সময় পস্নাষ্টিক পর্দা ব্যবহার করা হয়।
- ব্রুডার -কাম গ্রোয়ার হাউজে বাচ্চা ব্রুডিংয়ের জন্য নিদিষ্ট স্থান পস্নাষ্টিক পর্দা দ্বারা ঘিরে পৃথক করতে হয় এবং ঘেরা স্থানে ব্রুডার স্থাপন করতে হয়।

ব্রুডার ও ঘরের তাপ মাত্রাঃ

ঘরের তাপ মাত্রা ঃ

ঘরে বাচ্চা প্রদানের সময় ঘরের তাপ মাত্রা ৭৫ ডিগ্রী ফাঃ থাকে এবং ব্রুডিং শেষে ৬৫-৭৫ ডিগ্রী ফাঃ তাপমাত্রা রাখা হয়।

ব্রুডারের তাপ মাত্রা ঃ

বাচ্চার বয়স	লেয়ার বাচ্চা				ব্রয়লার বাচ্চা				
সপ্তাহ	শীতকাল		গ্রীষ্মকাল		শীতকাল		গ্রীষ্মকাল		
	ফাঃ	সেঃ	ফাঃ	সেঃ	ফাঃ	সেঃ	ফাঃ	সেঃ	
১-২	৯৫.০	৩৫.০	৯১.০	৩২.৭	৯০.০	৩২.২	৮৬	৩০	
২-৩	৯০.০	৩২.২	৮৬.০	৩০.০	৮৫.০	২৯.২	৮১.০	২৭.২	
৩-৪	৮৫.০	২৯.৪	৮১.০	২৭.২	৮০.০	২৬.৬	৭৫.০	২৩.৮	
৪-৫	৮০.০	২৬.৬	৭৫.০	২৩.৮	৭৫.০	২৩.৮	-	-	
৫-৬	৭৫.০	২৩.৮	-	-	-	-	-	-	

বাচ্চা ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা

ব্রুডার চালূ ও পাত্রে পানি প্রদান

- বাচ্চা গ্রহণের দিন ব্রুডারে পানির পাত্রে পানি দেয়ার পর এবং বাচ্চা গ্রহণের ৩ ষন্টা পূর্বে ব্রডার চালু (তাপ উৎপাদন) করতে হয়। বেশী আগে চালু করলে লিটার বেশী শুকিয়ে যায় এবং পরে চালু করলে পানির তাপমাত্রা যথেষ্ট পরিমান হয় না । পানির তাপমাত্রা ৬৫ ফাঃ (১৮সেঃ) হওয়া বাঞ্ছনীয় । (পানি প্রদান পদ্ধতি দ্রষ্টব্য)
- এই সময় প্রশস্ত্থ খাদ্য পাত্র হিসাবে কাগজ /চিক বাক্সের ঢাকনি/পস্নাষ্টিক ট্রে হোভারের নীচে স্থাপন করা হয়।

ব্রুডারে বাচ্চা প্রদান ঃ

- খামারে বাচ্চা পৌছানোর সাথে সাথে পূর্ব থেকে প্রস্তুত পরিচার্যকারী বাচ্চার সরবরাহ গ্রহণ করবে এবং দ্রুত ব্রুডারে প্রদান করবে।
- সাধারনতঃ সকালের দিকে ব্রুডারে বাচ্চা প্রদান করলে পরিচর্যা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় এবং সকালে আবহাওয়া ঠান্ডা থাকার দরুন কম ধকল সৃষ্টি হয়।
- বাচ্চা গ্রহণের সময় চিক বাক্সের ভিতর মৃত বাচ্চা থাকলে তার সংখ্যা হিসাব করতে হয়।
- সম্ভব হলে বাচ্চার প্রাথমিক নমুনা ওজন রাখা যায়।
- বাচ্চা সরবরাহ তালিকার সাথে কোন অমিল থাকলে হিসাবে আনতে হয় এবং বাচ্চা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করতে হয়।

বাচ্চার আচরণ পরীক্ষাঃ

- ব্রুডারে বাচ্চা প্রদানের পর বাচ্চার আচরণ পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ্
- বাচ্চার জন্য অনুকুল তাপমাত্রা বাচ্চার আচণ দেখে অনুমান করতে হয়, যেমন-

- ব্রুডারে তাপ বেশি হলে বাচ্চা তাপের উৎস হতে দূরে যায় এবং ব্রুডার গার্ডের গা ঘেষে জমা হয় ।

-ব্রুডারে তাপ কম হলে তাপের উৎসের নীচে বেশী তাপের আশায় বাচ্চা ভীড় করে এবং পরস্পর জড়াজড়ি করে গরম হতে চেষ্টা করে। এই অবস্থায় চাপাচপিতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে বাচ্চা মারা যায়।

-তাপ বাচ্চার অনুকূলে থাকলে বাচ্চা স্বতঃস্ফুর্ত থাকে এবং সুষ্ঠুভাবে খাদ্য খায় ও পানি পান করে।

-বাচ্চা স্বতঃস্ফুর্তভাবে চলাচল ও পানি পান না করলে বুঝতে হয় পরিবহন জনিত ধকলে পীড়িত অতবা অসুস্থ।

* হোভার অথবা তাপের উৎস উঁচু-নীচু করে তাপ কম -বেশী করা হয়।

* ব্রুডারে বাচ্চা দেওয়ার পর রুটিন মত পর্যবেক্ষণ যথেষ্ট নয়। বার বার ব্রুডার ঘরে প্রবেশ করে আচরণ পরীক্ষার পর ব্যবস্থা নিতে হয়। ২ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত বাচ্চার অত্যন্ত সংকটময় সময় ।

* হঠাৎ করে আলো নিভে যাওয়া, ঘরের তাপমাত্রা পরিবর্তন, ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা, খাদ্য ও পানির পরিবর্তন, বিভিন্ন প্রকার শব্দ ও হট্টগোল বাচ্চার ধকল সৃষ্টি করে। বাচ্চার আচরণ দেখে এ সমস্ত ধকল প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

* ব্রুডারে বাচ্চা দেওয়ার পর তারা পানি পান করে।

ব্রুডারে বাচ্চার পানি পান করার প্রবণতা পরীক্ষা করা হয়। প্রত্যেক বাচ্চা যাতে সহজে পানি পান করতে পারে সে ব্যবস্থা নিতে হয়। প্রয়োজন হলে হাতে ধরে পানি পান করাতে হয়।

খাদ্য প্রদান

- ব্রুডারে বাচ্চা দেওয়ার ২-৩ ঘন্টা পর প্রত্যেক বাচ্চার সঠিক পানি পান নিশ্চিত হয়ে প্রাথমিক পাত্রে ষ্টার্টার রেশন প্রদানের পূর্বে গম , ভুট্টা চূর্ন অথবা চাউলের খুঁদ দেওয়া যায়।

লিটার ব্যবস্থাপনা

- লিটার বেশী ভিজা হলে যেমন বিভিন্ন প্রকার গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তেমনি ককসিডিয়া ,কৃমি ও রোগ জবিাণুর বংশ বিস্তার বৃদ্ধি পায় । তাছাড়া বাচ্চার দেহে পালক গজানোর হার কমে যায়।
- বাচ্চা তাপের উৎসের নীচে বেশী জমা হওয়ার কারণে সেখানে বেশী মলত্যাগ করে, ফলে লিটার দ্রুত আর্দ্র হয়।
- লিটার বেশী শুকনা হলে বাচ্চার দেহ হতে জলীয় অংশ শোষন করার ফলে ডি-হাইড্রেশন হয়।
- লিটার সঠিকভাবে পরিচর্যা করলে এ অবস্থা হয় না।

ব্রুডার স্থানান্তার

- প্রতিসপ্তাহে ব্রুডারের তাপমাত্রা ৫ ফাঃ কমাতে হয় যতক্ষণ না ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রার(৭৫ফাঃ) সমান হয়।
- বাচ্চা বড় হওয়ার সাথে সাথে বাচ্চা প্রতি বেশী স্থান প্রদানের জন্য ব্রুডারের চারদিকের ঘেরাও দেয়া পর্দা এবং ব্রুডার গার্ড সরিয়ে স্থান প্রশস্ত করতে হয়।
- গ্রীষ্মকালে ২ সপ্তাহ এবং শীতকালে ৩ সপ্তাহ বয়সের পর এই পর্দা ও ব্রুডার গার্ডের প্রয়োজন হয় না ।
- গ্রীষ্মকালে ৩ সপ্তাহের পর এবং শীতকালে ৪ সপ্তাহের পর ব্রুডার তাপের প্রয়োজন হয় না, এ সময়ে হোভার উঁচূতে তুলে রাখা হয়।

ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা

- ঘরের উন্মুক্ত স্থানে ব্যবহৃত পর্দা ২ সপ্তাহ বয়সেরর পর দিনের বেলা খুলে দেয়া হয় এবং রাত্রে বন্ধ করতে হয়।
- সাধারণত : উন্মুক্ত ঘরে পর্দা খুলে দেয়া এবং রাত্রে বন্ধ করাই যথেষ্ট নয় বরং উন্নতমানের পুলেট তৈরীর জন্য আবহাওয়ার অবস্থা বুঝে দিন রাত্রের মধ্যে কয়েকবার পর্দা খোলা ও বন্ধ করার প্রয়োজন হয়।

মডিউল -৪

পুলেট বা বাড়ন্ত বাচ্চা পালন

৬ সপ্তাহ বয়সের পর ডিম পাড়তে শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত স্ত্রী বাড়ন্ত বাচ্চাকে পুলেট এবং পুরুষ বাচ্চাকে ককরেল বলে।

৪.১ ।পুলেট পালন পরিকল্পনা ঃ

পুলেট পালন করার জন্য ৪ প্রকার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়। এই পরিকল্পনা বাচ্চা ব্রুডিং হতে শুরু হয়। যেমন-

ক) অল -ইন-অল আউট পরিকল্পনা,খ) মালটিপল রিয়ারিং পরিকল্পনা, গ) আইসোলেশন রিয়ারিং পরিকল্পনা, ঘ) সিজনাল রিয়ারিং পরিকল্পনা ।

ক) অল -ইন-অল আউট পরিকল্পনা ঃ

এই পরিকল্পনার মধ্যে খামারে শুধু একই বয়সের বাচ্চা ব্রুডিং থেকে শুরুকরে ডিম পাড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন বয়সের বাচ্চা ,পুলেট অথবা লেয়ার রাখা হয় না।

খামারে বাচ্চা ব্রুডিং ও পুলেট উৎপাদন করে বিক্রি করার জন্য অথবা ব্রয়লার পালন করারর জন্য এই পরিকল্পনা বেশী উপযোগী ।

এই পরিকল্পনার সুফলঃ

খামারে একই সাথে বিভিন্ন বয়সের মুরগি না থাকার কারনে রোগ বিস্তারের সম্ভাবনা থাকে না ।

প্রতি ব্যাচ বাচচার পালন শেষে পরবর্তী ব্যাচ বাচ্চা পালন করার পূর্বে ২ সপ্তাহ ঘর খালি রাখা হয় ফলে-

ক) রোগ জীবানুর জীবন চক্রের ছেদ ঘটে।

খ) ঘর পরিষ্কার ও জীবানুমুক্ত করা যায়

গ) ঘরের সংস্কার ও সম্প্রসারন করা যায়।

ঘ) পরিচর্যাকারীকে অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যায়।

ঙ) নতুন উদ্যোক্তার জন্য এই পদ্ধতি অনেক ভালো।

খ) মালটিপল রিয়ারিং পরিকল্পনা

* খামারের একই সাথে বিভিন্ন শেডে বিভিন্ন বয়সের মুরগি থাকে্

* লেয়ার খামারে বিভিন্ন লেয়ার শেডে বিভিন্ন বয়সের লেয়ার মুরগী ও ব্রুডার –কাম- গ্রোয়ারহাউজে রিপেস্লসম্যান্ট ষ্টক পালন করা হয়।

* এই পরিকল্পনার ফলে খামারে ডিম উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়।

লেয়ার খামারে মাল্টিপল রিয়ারিং পরিকল্পনা গ্রহন পদ্ধতিঃ

বাজারে ডিম সরবারাহের ধারাবাহিকতা রাখার জন্য এই পরিকল্পনা গ্রহন করতে হয়।

- সেক্ষেত্রে বিভিন্ন শেডের জন্য স্বতন্ত্র উপকরন ও পরিচর্যাকারী থাকে।
- এক শেড হতে অন্য শেডে নিদিষ্ট দুরত্ব বাজায় রাখতে হয়।
- সেনিটেশন ব্যবস্থা বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়।
- পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘর তৈরী করা যায়।

আইসোলেশন রিয়ারিং পরিকল্পনা

- স্বতন্ত্র ব্রোডার ঘরে বাচ্চা ব্রডিংএর পর অথবা ব্রডিং কাম গ্রোয়ার হাউজে পুলেট উৎপাদনের পর স্বতন্ত্রভাবে স্থাপিত লেয়ার খাখারে স্থানান্তর করতে হয়।
- এই পরিকল্পনা অত্যধিক ব্যয়বহুল । শুধু পুলেট উৎপাদনের জন্য এ পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় ।

সিজনাল রিয়ারিং পরিকল্পনা ঃ

- পুলেট উৎপাদনের জন্য আলোর ভুমিকা অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। সাধারণত : ৮ সপ্তাহ হতে ১৮ সপ্তাহের পূর্ব পর্যন্ত দৈনিক ৮ ঘন্টা আলোক সময়ের প্রয়োজন হয়।
- পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘরে ছাড়া পুলেটের জন্য ৮ ঘন্টা আলোক সময় প্রদান সম্ভব হয় না।
- সাধারণতঃ ডিসেম্বর মাসে দিনের দৈর্ঘ্য ৯ হতে ১০ ঘন্টা হয় বাচ্চার বাড়ন্ত বয়স কাল ডিসেম্বর মাস হলে তাকে সিজনাল রিয়ারিং বলে।
- সাধারনতঃ আগষ্ট হতে অক্টোবর মাসে উৎপাদিতত বাচ্চার বাড়ন্ত বয়স কম -বেশী ডিসেম্বর মাস হয় ।

সিজনাল রিয়ারিং পরিকল্পনার সুফল ঃ

- এই পুলেট অত্যন্ত উন্নতমানের হয়।
- বেশী ডিম পাড়ে এবং ডিম পাড়ার সময়কাল বেশী হয়।
- পালন খরচ কম।
- কৃত্রিম আলোর প্রয়োজন হয়না।

৪. ২ পুলেট নিবার্চণ

- দেহ সুগঠিত হবে।
- দেহ পালকে পরিপূর্ন থাকবে।
- চঞ্চল ও ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী হবে।
- মাইকো পস্নাজমা ও সালমোনিলা মুক্ত হবে।
- পরস্পর সমতা ৬০ ভাগের বেশী হবে।
- জাত ও বয়স অনুসারে নিধারিত ওজনের হবে।

পুলেট নিবার্চণের বয়স

- খাচায় পালন করতে হলে ১৫ সপ্তাহ বয়সে লেয়ার খাঁচায় স্থানান্তর করতে হয় । এই বয়স পুলেটের খাদ্য পরিবর্তন সময় ।
- লিটারে পালন করার জন্য ১৫-১৮ সপ্তাহ বয়সে লেয়ার ঘরে স্থানান্তর করা হয়।
- লেটারে পালিত বাচ্চা লিটার ,খাঁচা অথবা মাঁচার উপর এবং খাঁচায় পালিত বাচ্চা শুধু মাত্র খাঁচায় পালন করার জন্য উপযুক্ত।
- ১০ সপ্তাহ থেকে ২০ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত পুলেট পালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন সময়।

পুলেট পালন কর্মসূচী ঃ

- খামারে এক ব্যাচ মুরগির ডিম উৎপাদন শেষ হলে ২ সপ্তাহ পরে ঘরে নতুন ব্যাচ পুলেট দিতে হয়
- লেয়ার মুরগি পরিবর্তন ও নতুন পুলেটে ডিম উৎপাদন শুরু হওয়া পর্যন্ত ডিম উৎপাদনে ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়।
- লেয়ার মুরগি বাতিল ও নতুন পুলেট প্রদানের পূর্বে ঘর পরিষ্কার পরিছন্ন ,জীবানুমুক্ত করার জন্য ২ সপ্তাহ সময় দেয়া দরকার হয় ।
- খামারে ডিম উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য একাধিক লেয়ার শেড থাকে এবং প্রতি শেডে বিভিন্ন বয়সের লেয়ার পালন করার পুলেট উৎপাদন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় ।
- পুলেটের খাদ্য প্রদান ঃ খাদ্য প্রদান কর্মসূচী
- পুলেটের পানি প্রদান ঃ অলোক সময়সূচী
- পুলেটের পানি প্রদান ঃ পানি প্রদান পদ্ধতি
- স্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগ প্রতিরোধ ঃ ভ্যাকসিন প্রদান কর্মসূচী
-

প্রতিদিন পরিদর্শন

* প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় মুরগির আচরন পরীক্ষা করতে হয়।

* এসময় ঘরে মৃত ও দূর্বল মুরগি থাকলে অপসারন , রোগ নির্নয় ও প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

* মুরগির ঘরে কখনও পরিশুদ্ধ না হয়ে প্রবেশ করতে নেই।

মডিউল - ৫

৫.১ লেয়ার মুরগির সংজ্ঞা ও লেয়ার মুরগির ডিম উৎপাদনের বৈশিষ্ট্যঃ

* ১৮ সপ্তাহ থেকে ডিম পাড়ার শেষ পর্যন্ত মুরগিকে লেয়ার মুরগি হিসাবে গন্য করা হয়।
বাস্তাবে ডিম পাড়া মুরগিকেই ডিম পাড়া মুরগি হিসেবে আমারা মনে করি।তাই তো ১৮ সপ্তাহ বয়সে থেকে মুরগিকে লেয়ার খাদ্য দেওয়া হয় ।

ডিম উৎপাদনেরবৈশিষ্ট্যঃ

* ২০ সপ্তাহ বয়সে শতকরা ৫ ভাগ ডিম পাড়তে শুরুকরে।
* ২১ সপ্তাহ বয়সে শতকরা ১০ ভাগ ডিম উৎপাদন শূরু হয়।
* ২৬ হতে ৩২ সপ্তাহ বয়সে সর্বোচ্চ ডিম উৎপাদন হয়।
* সর্বোচ্চা ডিম উৎপাদন শুরুও পর কিছুদিন স্থিতিশীল থাকে । এ সময় ডিমের আকার তেমন বড় হয় না। পরবর্তীতে উৎপাদন হার কমতে থাকে এবং ডিমের আকার বড় হতে থাকে।
* ৫০ সপ্তাহ বয়সের পর ডিমের আকার স্থিতিশীল হয় এবং ৪০ সপ্তাহ বয়সের পর ওজন বৃদ্ধি স্থিতিশীল হয়।
* কম বেশী সকল প্রকার বাণিজ্যিক ডিম পাড়া মুরগির বৈশিষ্ট্য অনুরুপ।

৫.২ খাদ্য প্রদান

ডিম উৎপাদন শুরু হওয়ার ২ সপ্তাহ পূর্ব থেকে খাদ্যেও শতকরা ২ভাগ ঝিনুক চূর্ণ ব্যবহার এবং ২০ সপ্তাহ বয়স হতে লেয়া খাবার ব্যবহার শুরুকরতে হয়।
ডিমউৎপাদনের শুরুও ৪/৫ দিন পূর্ব থেকে পুলেটের খাদ্য খাওয়ার পরিমান করতে থাকে এবং শতকরা ২০ভাগ পর্যন্ত কমতে থাকে ।

ডিম উৎপাদনের শুরুর পর ৪/৫ দিন পর্যন্ত দ্রুত খাওয়ার পরিমান বাড়তে থেকে এবং পরবর্তীতে এই বৃদ্ধি কমে আসে।
ডিমপাড়তে শুরু করার পর লেয়ার মুরগির তিন ধাপে খাদ্য প্রদান করতে হয়।

পানি প্রদান

পানি প্রদান কর্মসূচী দ্রষ্টব্য

আলোক প্রদান

আলোক প্রদান কর্মসূচী দ্রষ্টব্য ।

৫.৩ লেয়ার মুরগির স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ঃ

* প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় মুরগির আচরন পরীক্ষা করতে হয়।
* আবহাওয়ার তাপমাত্রা অনুসারে পানি পান করার পরিমান যাচাই করতে হয়।
* খাদ্য খাওয়া ও পানি পান করার পরিমানের উপর মুরগির স্বাস্থ্যের অবস্থা নির্ভর করে।
* ঘরে মুরগির মৃত্যূ হলে মৃত্যুর কারন অনুসন্ধান করতে হয়এবং দ্রুত মৃত মুরগির শতকারের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হয়।
* নিয়মিত টীকা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হয়।
* স্থানীয় প্রাণিচিকৎসকের পরামর্শক্রমে খাদ্য বা পানির সাথে ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা নিতে হয়।
* মুরগির পালন পদ্ধতি অনুসারে মেঝেতে স্থান নির্ধারন হতে হবে।
* খামারের জৈব নিরাপত্তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

৫.৪ লেয়ার মুরগির ডিমপাড়া বাক্স প্রদান ও ব্যবস্থাপনা, ডিমসংগ্রহ ,ডিম বাছাই ও গ্রেডিং ঃ

* ডিমপাড়া বাক্সের ধরন ঃ ডিম পাড়ার জন্য প্রতিটি খোপের স্থান ১২ ইঞ্চি ১৪ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ১৪ ইঞ্চি
* এই বাক্স একক বা কলোনি টাইপ হতে পারে।
* ৪-৫ টি মুরগির জন্য একটি খোপ ব্যবহার করা যাবে এইঅনুপাতে ঘরে বাক্স দিতে হয়।
* বাক্সে যথেষ্ট ভেন্টিলেশন যুক্ত কিন্তু অন্ধকার হওয়া বাঞ্ছনীয় ।
* বাক্সের সম্মুখে মুরগি উঠার জন্য পাটফরম থাকে। পাটফরম তুলে দিলে বাক্সে ঢোকার দরজা বন্ধ হয়ে যায়।
* বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজন মাফিক ডিম পাড়ার বাক্সব্যবহার করা হয়।
* ডিম উৎপাদন শুরু করার ১ সপ্তাহ আগে গড়ে ডিমের বাক্স স্থাপন করতে হয় এবং ডিমের বাক্সের দরজা দিনের বেলায় খোলা রাখতে হয় ।
* বাক্সের নিচে ৬ ইঞ্চি হতে ১ ফুট উচুঁ থাকা প্রয়োজন, অন্যথায় লিটর পরিচর্যায় অসুবিধা হয় ।
* ডিমের বাক্সের ভিতর ডিম পাড়ার জন্য আরামদায়ক বিছানা অর্থাৎ লিটার সামগ্রী ব্যবহার করতে হয়।
* ডিমের বাক্সের ভিতর ডিম পাড়ার জন্য অভ্যস্ত করতে পূর্ব থেকে ১টি ডিম স্থাপন করলে ভাল হবে।
* ডিমের বাক্স ঘরের ভিতর কিছুটা অন্ধাকার স্থানে স্থাপন করা উচিত।

ডিম সংগ্রহ

* শীতের সময় সকাল ১০ থেকে ১১টা এবং বিকাল ৪টা থেকে ৪.৩০টার সময় ডিম সংগ্রহ করতে হয়।
* গরমের সময় সকাল – বিকাল ছাড়াও দুপুরে আর একবার ডিম সংগ্রহ করতে হয়।
* সন্ধ্যার সময় বাক্সের ভিতর কোন ডিম না রেখে সকালে দরজা খোলার সময় ১টি করে ডিম রাখা হয়।

ডিম বাছাই ব্যবস্থাপনা

- ফাটা ডিম সাথে সাথে পৃথক না করলে সমস্ত ডিম নষ্ট হয়ে যায়।
- ডিমের শেল পাতলা হলে খাদ্যের পুষ্টি মান পরীক্ষা করতে হয়।
- ডিমপাড়া বাক্সের বিছানা প্রতিদিন পরিষ্কার ও প্রয়োজনে নতুন লিটারসামগ্রী যোগ করতে হবে।
- ডিম সংগ্রহের সময় ডিমের ট্রেতে ডিম সংগ্রহ করা উচিত
- অসুস্থ ও অনুৎপাদনশীল মুরগি পৃথক করতে হয়।
- ডিম সংগ্রহের সময় স্বয়ক্রিয় যন্ত্রের ক্রুটি পরিক্ষা করা উচত।
- ডিম সংগ্রহের সময় ডিমের মোটা মাথা উপরের দিকে এবং সরু মাথা নিচের দিকে থাকবে।

ডিমের গ্রেডিং

- ডিম বাজার জাত করার পূর্বে ডিম বাছাই ও গ্রেডিং করতে হয়।
- ডিমের আকার ও জন অনুসারে ডিম গ্রেডিং করতে হয়।
- দুই কুসুম বিশিষ্ট ডিম গুলোকে আলাদা করতে হয়।

৫.৫ লেয়ার মুরগির ডিম উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় ও বাজার জাত করন

* উন্নত মানের পুলেট তৈরী করার লক্ষ্যে বাচ্চা পালন থেকে শুরু করে ডিম পাড়ার শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা কোন ক্রুটি করা যাবে না ।
* ঠিকমত ব্রডিং ,টীক ,খাদ্য,পানি ,ঔষধ, ঘরের পরিচর্যা ,মুরগি ছাটাইপ্রক্রিয়া পালন করতে হবে।
* কোনঅবস্থাই মুরগিকে টীকা, ছাটাই প্রক্রিয়া ইত্যাদি সময়ে ধকলের সম্মূখীন হতে দেয়া যাবেনা।

বাজারজাতকরন

সঠিক সময়ে বাজার জাত করতে না পারলে খামারে অনেক ক্ষতি হয় । খামারের নির্ধারিত কর্মসূচী অনুসারে মুরগি ও ডিম বাজার জাত করতে হয়। অনেক সময় ডিম অনেক দিনের হয়ে গেলে পঁচে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে, তাতে খামারে যথেষ্ট ক্ষতি হয়। অনেক সময় ফুটানো ডিমের চাহিদা থাকে । ফুটানো ডিম বিক্রয় করতে হলে মুরগির সাথে মোরগ থাকতে হবে। ফুটানো ডিমের দাম অবশ্যই খাবার ডিমের চেয়ে অনেক বেশী হবে। এলাকার বাজার ব্যবস্থানুসারে বাজার জাত করাই শ্রেয়।

মডিউল-৬

ব্রয়লার পালন

৬.১ ব্রয়লার পালন কর্মসূচীঃ

* ব্রয়লার পালন করার জন্য অল-ইন-অল আউট কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত।
* পরবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘরে মালটিপল রিয়ারিং কর্মসূচী গ্রহন করা হয় । এই কর্মসূচীর অধীনে চক্রকারে বিভিন্ন শেডের বিভিন্ন বয়সের ব্রয়লার পালন করলে সারা বৎসর উৎপাদন ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়।

ব্যাচ প্রতি বাচ্চার সংখ্যা নির্ধারণ ঃ

- ব্রয়লার কাম গ্রোয়ার হাউজে ব্রয়লার পালন করা হয় ।
- ঘরের আয়তন অনুসারে বাচ্চা প্রতি ১ বর্গফুট হিসাবে বাচ্চার সংখ্যা নির্ধারন করতে হয় ।
- বাণিজ্যিক খামারে ব্রয়লার ঘরের আয়তন এমন হওয়া উচিত যেখানে একজন পরিচর্যাকারীর সার্বক্ষণিক কর্মসময়ের পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত হয় । অন্যথায় শ্রমের অপচয় হয়।
- একজন পরিচর্য্যাকারী দৈনিক ৫০০০ বাচ্চার পরিচর্যা করতে পারে। যেখানে আধুনিক ব্যবস্থার অভাব ও দক্ষতা কম সেখানে সার্বাধিক ২,৫০০ বাচ্চা পালন করার জন্য ১ জন পরিচর্যাকারী প্রয়োজন।

বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণঃ

- অল-ইন-অল আউট কর্মসূচীর অধীনে প্রতি ব্যাচ ৫ সপ্তাহ হিসাবে সর্বোচ্চ ৭ ব্যাচ ব্রয়লার পালন করা যায়।
- প্রতি ব্যাচ ব্রয়লার উৎপাদন শেষে ২/৩ সপ্তাহ ঘর খালি রাখলে মোট ১৭ সপ্তাহ ঘর খালি থাকে।
- ঘর খালি সময়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, জীবানুমুক্তকরণ, সংস্কার ইত্যাদি কাজ করা হয়।
- পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘরে মালটিপল কর্মসূচী অনুসারে বিভিন্ন শেডের ধারণ ক্ষমতা হিসেব করে প্রতি ব্যাচে বাচ্চার সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘর ছাড়া উন্মুক্ত ঘরে মালটিপল ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত নয়।

আর্দশ ব্রয়লার পালন শেড (ব্রুডার -কাম-গ্রোয়ার) হাউজ ঃ

ব্রয়লার পালন শেডের নক্সা

(১)ফুড প্যাড (২) বেসিন (৩) শেডের ব্যবহারের জুতা (৪) গ্লাস উইন্ডো (পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘরে)
(৫) দরজা (৬) স্বতন্ত্র কাপড় রাখার জন্য অয়ারড্রপ (৭) শেডের রেকর্ডপত্র (৮) শেডে প্রবেশপথ (৯) ব্রুডার স্থাপন (১০) শেডের ৮ ফুট দরজা (বড় আকারের শেডে ট্রাক্টর ঢুকে লিটার পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত হয়)।

ব্রুডিং ও গ্রোয়িং ব্যবস্থা ঃ

- ঘরের মধ্যে আংশিক স্থান ঘিরে বাচ্চা ব্রুডিং করা হয়।
- বাচ্চার বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্রুডার গার্ড প্রশস্ত করে থাকার স্থান বৃদ্ধি করা হয়।
- গ্রীষ্মকালে ১০-১৫ দিন পর এবং শীতকালে ১৫-২১ দিন পর ব্রুডার গার্ডের প্রয়োজন হয় না। এই সময় ঘরের তাপমাত্রা ৭০-৭৫ ডিঃ ফা: থাকে।
- ব্রুডিং শেষে হোভার উঁচুতে তুলে রাখা হয়

দেহের পালক গজানোর জন্য লিটারের অবস্থা ঃ

- লিটারের আর্দ্রতা শতকরা ২৫ ভাগ থাকা উচিত।
- লিটারের আর্দ্রতা শতকরা ৩০ ভাগ অতিক্রম করলে ককসিডিয়ার আক্রমন বৃদ্ধি পায় । তাছাড়া এমোনিয়া ও অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাস বৃদ্ধির ফলে শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং দেহে পালক গজানোর হার কমে যায়।

৬.২ খাদ্য ও পানি ঃ

লেয়ার বাচ্চার অনুরুপ

পানি ঃ

লেয়ার বাচ্চার অনরূপ

ব্রয়লার মুরগির তাপমাত্রা

বাচ্চার বয়স	লেয়ার বাচ্চা				ব্রয়লার বাচ্চা				
সপ্তাহ	শীতকাল		গ্রীষ্মকাল		শীতকাল		গ্রীষ্মকাল		
	ফাঃ	সেঃ	ফাঃ	সেঃ	ফাঃ	সেঃ	ফাঃ	সেঃ	
১-২	৯৫.০	৩৫.০	৯১.০	৩২.৭	৯০.০	৩২.২	৮৬	৩০	
২-৩	৯০.০	৩২.২	৮৬.০	৩০.০	৮৫.০	২৯.২	৮১.০	২৭.২	
৩-৪	৮৫.০	২৯.৪	৮১.০	২৭.২	৮০.০	২৬.৬	৭৫.০	২৩.৮	
৪-৫	৮০.০	২৬.৬	৭৫.০	২৩.৮	৭৫.০	২৩.৮	-	-	
৫-৬	৭৫.০	২৩.৮	-	-	-	-	-	-	

৬.৩ ব্রয়লার মুরগির উদরে চর্বি গঠন ঃ

- ব্রয়লার খাদ্যে চর্বি /তৈল উপকরণ হার বৃদ্ধি করা হলে উদর বা তলপেটে চর্বি জমতে শুরু করে।
- খাদ্যে বিপাকীয় শক্তি কমানো হলে আমিষ ও অন্যান্য পুষ্ট উপাদান গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধিপায় । কিন্তু খাদ্য রূপান্তর হার কমে যাওয়ার ফলে তলপেটের চর্বির স্তর বড় হয়।
- এই স্তর বৃদ্ধির পরিমান খাদ্য রূপান্তর হারের সাথে সংম্পৃক্ত কারণ মাংস বৃদ্ধির তুলনায় চর্বির স্তর বৃদ্ধি জন্য বেশী খাদ্যের প্রয়োজন হয়।
- খাদ্য রূপান্তর হার কম হলে দেহে চর্বির পরিমান বৃদ্ধি পায়।
- খাদ্য রূপান্তর হার বৃদ্ধির জন্য সমাপ্তি খাদ্যে বিপাকীয় শক্তির হার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
- খাদ্যে চর্বি বা তৈল জাতীয় উপকরন ব্যবহার দ্রষ্টব্য।

ব্রয়লারের চর্বি কমানোঃ

* বৎসরে সমস্ত সময় বাণিজ্যিক ব্রয়লার উৎপাদন, শারীরিক বৃদ্ধি ও খাদ্য রূপান্তর হার বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টার অন্ত থাকে না। এই প্রচেষ্টার ফলে দেহে চর্বির পরিমান অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় এবং সমস্ত দেহে বন্টন হয় তলপেটে চর্বি বৃদ্ধির পরিমাণ এত ব্যাপক যে প্রক্রিয়াজাত করার সময় চর্বি বাদ দিতে হয়।

সাপ্তহিক ওজন ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

খাদ্য ও ওজন বৃদ্ধির পরিমান হাঁস-মুরগির খাদ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা মডিউল -৯ অনুসারে করা বাঞ্চনীয় ।

আলোক ব্যবস্থাপনা ঃ

মডিউল -৭ এ বর্নিত আলোক ব্যবস্থাপনা দ্রষ্টব্য।

ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাত করণ

ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাত করনের ফলে যাতে করে মাংস উন্নত মানের হয় অর্থাৎ কোন রকমের ত্রুটি না থাকে । যেমন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন , রোগজীবানুমুক্ত, থেতলানো ইত্যাদি বিষয়াদি নিশ্চিতকরনের উদ্দেশ্যেই প্রক্রিয়া জাতকরন করা হয়।

প্রক্রিয়াজাত পূর্ব প্রস্তুতিঃ

- ব্রয়লার প্রক্রিয়াজাত করার জন্য ধরার ২/৩ ঘন্টা পুর্ব থেকে খাদ্য বন্ধ রাখতে হয়ফলে পরিপাকতন্ত্রের সালমোনিলা জীবানুর পরিবৃদ্ধি কমে যায়।
- খাদ্য বন্ধ রাখার ফলে ব্রয়লার মুরগি কিছুটা ওজন হারায় ।
- ব্রয়লার মুরগি দুই পর্যায়ে অনাহারে থাকে। যেমন খামারে অবস্থানকালে ধরার পূর্ব এবং খামার থেকে প্রক্রিয়াজাত কারখানায় পৌঁছানো পর্যন্ত। ২ পর্যায়ে মোট ৮ থেকে ৯ ঘন্টার অতিরিক্ত অভুক্ত রাখা উচিত নয়।
- অভুক্ত সময়ে ২ থেকে ৩ ভাগ ওজন হারানো উচিত । বেশী সময় অভুক্ত থাকলে বেশী পরিমান ওজন হারাবে ইহা ব্রয়লারের গুনগত মান নষ্ট করে।
- মুরগি ধরে খাঁচায় ঢোকানোর পূর্ব পয়ন্ত পানি প্রদান করা হয়। এ সময় পানি প্রদান করা হয় না।
- প্রক্রিয়াজাত করার পর মাংস পরিচর্যা ও চিলিং করার সময় ২/৩ অংশ ওজন উন্নত হয়।
- খাঁচায় বা ক্রেটের ভিতরে ঢোকানোর পর প্রক্রিয়াজাত করা পর্যন্ত আর পানি প্রদান করা হয় না।

ব্রয়লার মাংস থেতলানো বা বিবর্নতা ঃ

* ব্রয়লার মাংস উৎপাদন এক জিনিস এবং মাংসের গুনগত মান অক্ষুন্ন রেখে বাজারজাতকরণ আলাদা জিনিস।

* ব্রয়লার ধরা বা হাতানোর সতয় অত্যন্ত সতকর্তা অবলম্বন না করলে মাংস থেতলানো হয়, বিবর্নতা সৃষ্টি হয় এবং মাংসের গুনগত মান ক্ষুন্ন হয়।

* ব্রয়লার ধরা জন্য পরিচর্যাকারীদের সঠিক প্রশিক্ষন ও কলাকৌশল বিষয়ে অবহিত করতে হয়।

(ক) প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিক্রয়ের ৫ দিন পূর্ব কাঁকর প্রদান বন্ধ রাখতে হয়।

(খ) ফিনিশার খাদ্যের সাথে সমস্ত প্রকার ঔষধ ব্যবহার প্রক্রিয়াজাত করার ৫ দিন পূর্বে সম্পূর্ন বন্ধ রাখতে হয়।

(গ) রাত্রে যখন মুরগি শান্ত থাকে তখন ধরতে হয় এবং ক্রেস বা খাঁচার মধ্যে ভরতে হয়।

(ঘ) মুরগি ধরার ২ ঘন্টা পুর্বে খাদ্য প্রদান বন্ধ রাখতে হয়।

মাংস থেতলানো ও বিবর্ণতা পরিহার ব্যবস্থাপনাঃ

- লিটার ভিজতে অথবা দলা বাধতে দেওয়া যাবে না ।
- লিটারের অর্দ্রতা শতকরা ২৫-৩০ ভাগের বেশী বা কম রাখা যাবে না।
- ঘরে এমোনিয়া সৃষ্টি হতে দেওয়া যাবে না।
- পর্যাপ্ত পরিমাণ ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ব্রয়লার মুরগি প্রতি যথেষ্ট পরিমাণ মেঝেতে স্থান থাকতে হবে।
- মুরগি ধরা, ক্রেটে ভরা পরিবহণ করা, ক্রেটে থেকে বের করা , জবেহ করা ইত্যাদি সময়ে অতিযত্ন ও সতর্ক ব্যবস্থা নিতে হবে।

- মুরগি ধরার পুর্বে উত্তেজিত করা যাবে না । উত্তেজিত হলে খাবার পাত্র, পানির পাত্র, দেওয়াল ইত্যাদির সাথে আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং দেহের চামড়া ছুড়ে যায়, দেহ থেত্লে যায়, ফলে মাংস বিবর্ন হয়।
- ব্রয়লার পরিবহণের জন্য ট্রাক অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত ঘরের কাছে নেওয়া উচিত নয়। দিনের আলোয় ট্রাকের শব্দে মুরগি উত্তেজিত হয়।
- ব্রয়লার মুরগি ধরার কৌশল সম্বন্ধে পরিচর্যাকারীদের সঠিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হয়।
- মুরগি ধরার সময় অন্ধকারের পূবেই ঘরের সমস্ত সরঞ্জাম সরিয়ে ফেলতে হয়।
- মুরগি ধরার সময় ঘরে ডিমলাইট অথবা লাল অল্প পাওয়ারের লাইট ব্যবহার করতে হয় । দিনের বেলা মুরগি ধরার প্রয়োজন হলে ঘর অন্ধকার করে নিতে হয়।
- মুরগি ধরার পর এক সাথে বেশী বহন করা উচিত নয়। একসাথে বেশী মুরগি ধরে বহনের সময় দেহ থেতলে যায় ও মাংস বিবর্ণ হয়।
- অত্যন্ত সর্তকর্তার সাথে ক্রেট বা কুপের ভিতর মুরগি ঢোকাতে হয়।
- ট্রাকের উপর সতকর্তার সাথে মুরগির ক্রেট বা কুপ সাজাতে হবে। কখনও জোরে ক্রেটে রাখা অথবা ক্রেট ফেলে দেওয়া যাবে না।
- মুরগির চামড়া ছুড়ে যাওয়া, দেহ থেতলানো এবং মাংস বিবর্ন হওয়ার কারণগুলো অত্যন্ত যত্নের সাথে অবলোকন করতে হয় এবং সেই মত ব্যবস্থা নিতে হয়।

মডিউল –৭
আলোক ব্যবস্থাপনা

৭.১। আলোর গুরুত্ব ঃ

* বাচ্চা আলোর সাহয্যে পানি পান ও খাদ্য চিনে খেতে পারে।
* পুলেটের যৌন পরিপূর্নতা নিয়ন্ত্রণ করে।
* ডিম উৎপাদনে হরমোন নিস্বরণ ঘটায়।
* খাদ্য রুপান্তরে ভুমিকা রাখে।

পুলেটের যৌন পরিপূর্ণতায় আলোক সময় নিয়ন্ত্রণঃ

* পুলেটের জন্য অলোক সময় বেশী হলে যৌন পরিপক্কতা তাড়াতাড়ি হয়। অর্থাৎ নিদিষ্ট বয়সের পূর্বে ডিম দিতে শুরু করে।

(ক) পুলেটের ওজন বেশী হয়।
(খ) ডিমের আকার ছোট হয়।
(গ) ডিম উৎপাদন হার হ্রাস পায়।
(ঘ) ডিম উৎপাদন সময়কাল কমে যায়।
(ঙ) সর্বোচ্চ ডিম উৎপদন সকয়কালের পরিবর্তন হয়।
(চ) ডিমের থলি প্রলাপসের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।
(ছ) পরস্পরের মধ্যে ক্যানাবলিজম সৃষ্টি হয়।

* ব্রুডিং হতে শুরু করে ক্রমান্বয়ে পুলেটের জন্য আলোক সময় কমাতে হয়।
* উন্নতজাতের পুলেট উৎপাদনের জন্য বাড়ন্ত বয়সে ৮ ঘন্টা আলোক সময় প্রয়োজন । এই সময় শুধু মাত্র পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘরে প্রদান সম্ভব ।
* উন্মুক্ত ঘরে রাত্রে অন্ধকার এবং দিনের আলো ব্যবহার করা হয়।
* উন্মুক্ত ঘরে পুলেটের জন্য সর্বনিম্ন আলোক সময় প্রদান করতে হলে মৌসুমী বাচ্চা পালন করা যায়।

৭.২ ডিম উৎপদনে আলোক সময় নিয়ন্ত্রণঃ

* আলোর তীব্রতা ,আলোক দৈর্ঘ্য, এবং প্রত্যহ আলোক সময়ের পরিবর্তন মুরগীর ডিম উৎপাদন প্রভাবিত করে।
* আলোকরশ্মি মুরগীর চোখের মণিতে প্রতিফলিত হলে মস্তিকের পিটুইটারী গ্রন্থিতে জৈবিক অনুভুতি সৃষ্টি হয়। ফলে ফলিকুলার ষ্টিমুলেটিং হরমোন নিঃসৃত হয়।
* ফলিকুলার ষ্টিমুলেটিং হরমোন ডিম্বাশয়ের ডিম্ব কোষ পরিপক্ক হতে সাহায্য করে।

ডিম্ব কোষ পরিপক্ক হলে পিটুইটারী গ্রন্থি হতে লুটিনাইজিং হরমোন নিঃসৃত হয়ে ডিম্বাণুর স্খলন ঘটায়।

* মস্তিকের পিটুইটারী গ্রন্থিতে এই সংবেদনশীল প্রক্রিয়া সংঘটনের জন্য কমপক্ষে ১২ ঘন্টা আলোক সময় প্রয়োজন।
* আলোক সময় ১২ ঘন্টার উর্দ্ধে বাড়ানো হলে পুনরায় কমানোর পর ডিম উৎপাদনে বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এ কারণে আলোক সময় বৃদ্ধি করা হলে কোনক্রমেই কমানো যাবে না ।
* মৌসুমের বিভিন্ন সময়ে আলোক সময়ের পরিবর্তন হয়। যেমন ২৩ শে জুন দিনের দৈর্ঘ্য ১৪ ঘন্টার উর্দ্ধে এবং ২৩ ডিসেম্বর ১০ ঘন্টার নিচে।

মৌসুমের দীর্ঘ আলোক সময় ধরে লেয়ার মুরগির জন্য আলোক সময় নির্ধারণ করা হয়।

* লেয়ার মুরগির জন্য ১৫-১৬ ঘন্টা আলোক প্রদানের জন্য দিনের আলোক দৈর্ঘ্যের সাথে কৃত্রিম আলো সংয়োজন করতে হয়।
* দিনের অলো যদি ১২ ঘন্টা হয় তার সাথে সন্ধ্যার পর অথবা ভোরের পূর্বে ৪ ঘন্টা কৃত্রিম আলোক সময় যোগ করেত হয়। ৪ ঘন্টা আলোক সময় সন্ধ্যা ও ভোরের পুর্বে ভাগ করেও দেওয়া যায়।

আলোর তীব্রতা

বাচ্চা, পুলেট ও লেয়ার মুরগি এবং ব্রয়লারের জন্য আলোর তীব্রতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
মুরগির বয়স ও উপযোগিতা অনুসারে আলোক রশ্মির তীব্রতা ভিন্নতর হয়। আলোর তীব্রতা বেশী হলে -
(ক) ক্যানবলিজম বৃদ্ধি পায়।(খ) খাদ্য রুপান্তর হার হ্রাস পায়।
(গ) মুরগির চোখে যন্ত্রণা হয়।
(ঘ) বিদ্যুৎ খরচ বেশী হয়।
* আলোর তীব্রতা এমন পর্যায়ে থাকা উচিত যেন মুরগির পানি পান ও খাদ্য চিনে খেতে অসুবিধা না হয় এবং তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবস্থান করতে পারে।

আলোর তীব্রতার পরিমান ঃ

থাম্ব রুল অনুসারে ১ ওয়াট ইনকানডিসেন্ট বাল্ব থেকে ১২.৫৬ লমেন আলো বিচ্ছুরিত হয় এবং ১ ওয়াট ফ্লোরেসেন্ট বাল্ব থেকে ইনকানডিসেন্ট বাল্বের তুলনায় ৩ গুন বেশী আলো বিচ্ছুরিত হয়। ১ ওয়াট ফ্লোরেসেন্ট বাল্ব (১২.৫৬ী ৩) =৩৭.৬৮ =৩৭.৬৮ লুমেন।

ঘরে বাল্ব ব্যবহারের উচ্চতা ও দূরত্ব ঃ

ইনকানডিসেন্ট বল্ব ঃ লিটার ঘরে ৭-৮ ফুট (২.১০ মিটার ২.৪ মিটার) উঁচুতে বাল্ব স্থাপন করা হয়।
ফ্লোরোসেন্ট বাল্ব ঃ ঘরের আয়তন হিসাব করে ইনকানডিসেন্ট বাল্বের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ ওয়াটের বাল্ব ব্যবহার করলে সমপরিমাণ আলোর লুমেন পাওয়া যায়।
খাঁচার ভিতর মুরগির দেহে ০.৫ -১.৫ ফুট ক্যান্ডেল (৫.৩৮ -১৬.৫৭লাক্স) আলোর লুমেন প্রতিফলনের জন্য ঘরের মেঝে থেকে বাল্বের উচ্চতাঃ

ব্যবহৃত বাল্বের শক্তি	ঘরের মেঝে থেকে বাল্বের উচ্চতা (খাঁচাযুক্ত ঘরে)							
	০.৫-১.০ ফুট ক্যান্ডেল লুমেন				১.০- ১.৫ ফুট ক্যান্ডেল লুমেন			
	রিফ্লেক্টর সহ		রিফ্লেক্টর বাদে		রিফ্লেক্টর সহ		রিফ্লেক্টর বাদে	
ওয়াট	ফুট	মিটার	ফুট	মিটার	ফুট	মিটার	ফুট	মিটার
২৫	৬.৫	২.০	৪.৫	১.৪	৪.৫	১.৪	৩.০	০.৯
৪০	৯.০	২.৭	৬.৫	২.০	৬.৫	২.০	৪.৫	১.৪
৬০	১৪.০	৪.৩	১০.০	৩.১	১০.০	৩.১	৭.০	২.১
৭৫	১৫.৫	৪.৭	১০.৫	৩.২	১০.৫	৩.২	৭.৫	২.৩
১০০	১৯.০	৫.৮	১৩.৫	৪.১	১৩.৫	৪.১	৯.৫	২.৯

৭.৩ লেয়ার মুরগির ঘরে আলোক কর্মসূচী ঃ

(ক) ০ – ৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত ঃ

বয়স দিন /সপ্তাহ	দৈনিক আলোক সময়		প্রতি বঃ ফুট স্থানে ওয়াটের পরিমান ও লুমেন	
	পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘর	উন্মুক্ত ঘর	ওয়াট	ফুট ক্যান্ডেল
১-৩ দিন	২৪ ঘন্টা	২৪ ঘন্টা	০.৫৬	৩.৪৫
৪-৬ দিন	২৩ ঘন্টা	২৩ ঘন্টা	০৫০	৩.০৭
৭-৮ দিন	২৩ ঘন্টা	২৩ ঘন্টা	০.৩৭	২.৩০
২ সপ্তাহ	২৩ ঘন্টা	২৩ ঘন্টা	০.২৫	১.৫৪
২-৩ সপ্তাহ	২২ ঘন্টা	২২ ঘন্টা	০.২৫	১.৫৪
৩-৪ সপ্তাহ	১৮ ঘন্টা	১৮ ঘন্টা	০.১৯	১.১৫
৪-৫সপ্তাহ	১৬ ঘন্টা	১৬ ঘন্টা	০.১৯	১.১৫
৫-৬ সপ্তাহ	১৪ ঘন্টা	১৪ ঘন্টা	০.১৯	১.১৫

(খ) পুলেট ও লেয়ার মুরগির ঘরের আলোক সময়সূচী ঃ

বয়স দিন /সপ্তাহ	দৈনিক আলোক সময়		প্রতি বঃ ফুট স্থানে ওয়াটের পরিমান ও লুমেন	
	পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘর	উন্মুক্ত ঘর	ওয়াট	ফুট ক্যান্ডেল
৬-৭ সপ্তাহ	১২.০০ ঘন্টা	রাত্রে অন্ধকার	০.১৯	১.১৬
৭-৮ সপ্তাহ	১০.০০ ঘন্টা	ঐ	০.১৯	১.১৬
৮-১০ সপ্তাহ	৯.০০ ঘন্টা	ঐ	০.০৯৫	০.৫৮
১০-১১সপ্তাহ	৮.০০ঘন্টা	ঐ	০.০৯৫	০.৫৮
১১-১২ সপ্তাহ	৮.০০ঘন্টা	ঐ	০.০৯৫	০.৫৮
১২-১৩ সপ্তাহ	৮.০০ঘন্টা	ঐ	০.০৯৫	০.৫৮
১৩-১৪ সপ্তাহ	৮.০০ঘন্টা		০.০৯৫	০.৫৮
১৪-১৫সপ্তাহ	৮.০০ঘন্টা	ঐ	০.০৯৫	০.৫৮
১৫-১৬ সপ্তাহ	৮.০০ ঘন্টা	ঐ	০.০৯৫	০.৫৮
১৬-১৭ সপ্তাহ	৮.০০ ঘন্টা	ঐ	০.০৯৫	০.৫৮
১৭-১৮ সপ্তাহ	৯.০০ ঘন্টা	ঐ	০.১৯	১.১৫
১৮-২০ সপ্তাহ	১১.০০ ঘন্টা	১১.০০ ঘন্টা	০.১৯	১.১৫
২০-২১ সপ্তাহ	১২.০০ ঘন্টা	১২.০০ ঘন্টা	০.২৫	১.৫৪
২১-২২ সপ্তাহ	১২.৩০ ঘন্টা	১২.৩০ ঘন্টা	০.২৫	১.৫৪
২২-২৩ সপ্তাহ	১৩.০০ ঘন্টা	১৩.০০ ঘন্টা	০.২৫	১.৫৪
২৩-২৪ সপ্তাহ	১৩.৩০ ঘন্টা	১৩.৩০ ঘন্টা	০.২৫	১.৫৪
২৪-২৫ সপ্তাহ	১৪.০০ ঘন্টা	১৪.০০ ঘন্টা	০.২৫	১.৫৪
২৫-২৬ সপ্তাহ	১৪.৩০ ঘন্টা	১৪.৩০ ঘন্টা	০.২৫	১.৫৪
২৬-২৭ও উর্দ্ধে	১৫.০০ ঘন্টা	১৬.০০ ঘন্টা	০.২৫	১.৫৪

ব্রয়লারমুরগির ঘরের আলোক সময়সূচী ঃ

বয়স দিন /সপ্তাহ	দৈনিক আলোক সময়		প্রতি বঃ ফুট স্থানে ওয়াটের পরিমান ও লুমেন	
	পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘর	উন্মুক্ত ঘর	ওয়াট	ফুট ক্যান্ডেল
১-৩ দিন	২৪ ঘন্টা	২৪ ঘন্টা	২.৫৬	৩.৪৫
৪-৭ দিন	২৩ ঘন্টা	২৩ ঘন্টা	২.৫০	৩.০৭
৮-১৪ দিন	২০ ঘন্টা	২০ ঘন্টা	০.০৫৭	০.৩৫
১৫-২১দিন	১৮ ঘন্টা	১৮ ঘন্টা	০.০৫৭	০.০৩৫
২২-২৮ দিন	১৮ ঘন্টা	রাতে ৮ ঘন্টা অন্ধকার	০.০৫৭	০.০৩৫
২৯ -৩৫ দিন	১৮ ঘন্টা	রাতে ৮ ঘন্টা অন্ধকার	০.০৫৭	০.০৩৫
৩৬-৪২ দিন	১৮ ঘন্টা	রাতে ৮ ঘন্টা অন্ধকার	০.০৫৭	০.০৩৫

মডিউল -৮

হাঁস-মুরগির রোগসমূহ ও তার প্রতিকার

বাংলাদেশে প্রতি বৎসর বিভিন্ন রোগে বহু মোরগ– মুরগি মারা যায়। এ সকল রোগের মধ্যে প্রধান হচ্ছে রানীক্ষেত, মুরগির বসন্ত , মুরগির কলেরা, গামবোরো ,ইনফেকসাস ব্রংকাইটিস, রক্ত আমাশয় বা ককসিডিওসিস ইত্যাদি প্রধান।

রানীক্ষেত ঃ রানীক্ষেত রোগের জীবানু একপ্রকার ভাইরাস। সাধারনতঃ সকল বয়সের ও সকল জাতের মোরগ-মুরগিই রানীক্ষেত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। মোরগ মুরগী ছাড়াও কবুতর, দোয়েল, কোয়েল, কাক, পেঁচা, ঘুঘু, চড়ুই, শালিক, ময়ূর, কাকাতুয়া, টিয়া, ময়না ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার পাখি এই রোগ জীবানু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। হাঁস (পাতি হাঁস) বা রাজ হাঁসের সচরাচর এই রোগ দেখা যায় না।

রানীক্ষেত রোগের লক্ষনগুলোর মাঝে চুনা বা সবুজ রং এর রক্তাক্ত কিংবা তরল পায়খানাই প্রধান । রোগাক্রান্ত পাখীর শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হয়, বাচ্চা মোরগ-মুরগি হা করে শ্বাস নেয় মাঝে মাঝে আক্রান্ত মোরগ মুরগি ঘাড় বাঁকা হয়ে যায় তাছাড়া আক্র্রান্ত পাখীর পাখা ছেড়ে দিয়ে ঝিমাতে থাকে , খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে খাওয়াদাওয়া ও ডিম পাড়া বন্ধ করে দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগাক্রান্ত হবার এক সপ্তাহের মাঝেই মৃত্যু ঘটে থাকে। আবার কোন কোন সময় রোগের লক্ষন প্রকাশ পাওয়ার আগেই হঠাৎ মৃত্যু ঘটে।

মুরগির বসন্ত ঃ মুরগরি বসন্ত রোগের জীবানু একপ্রকার ভাইরাস। অনেক সময় রোগের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে মুরগির বসন্ত রোগকে কন্টাজিয়াস ইপিথেলিওমা ও এভিয়ান ডিপথেরিয়া বলা হয়।

সাধারনত ঃ মোরগ-মুরগি , কবুতর এই রোগজীবানু দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ ছাড়াও চড়ুই, ময়ূর , টিয়া ও অন্যান্য পোষা পাখী মাঝে মাঝে এই রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। যে কোন বয়সের মোরগ মুরগিই বসন্ত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।

বসন্ত রোগে মোরগ-মুরগির একমাত্র পালক বিহীনস্থানে লক্ষন প্রকাশ পায়। বিশেষতঃ এই রোগের মাথায় বিভিন্ন জায়গায় যেমন ঝুটি, লতি, মুখের কোনায়, চোখের পাতায় এবং মাঝে মাঝে পায়ে ছোট ছোট আঁচিলের মত গুটি দেখা যায় । গুটি হওয়ার আগে প্রথমে লাল হয় এবং রস জমা হয়। পরে কালকাল গুটি তৈরী হয়। মাথার বিভিন্ন জায়গায় এই ধরণের গুটিই মুরগীর বসন্ত রোগ নির্ণয়ের জন্য যথেষ্ট। এই রোগে মোরগ-মুরগি খাওয়া থেকে বিরত হয়ে যায়। ডিম পাড়া কমে যায়। এই রোগে বয়স্ক মোরগ-মুরগির মৃত্যুর হার কম। বাচ্চা মোরগ-মুরগির মৃত্যুর হার সাধারণত কিছুটা বেশী দেখা যায। ৩-৪ সপ্তাহ অসুখে ভোগার পর আপনা থেকেই বড় মোরগ-মুরগি ভাল হয়ে উঠে।

মুরগির কলেরা ঃ এক প্রকার ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা মুরগির কলেরা হয়ে থাকে এই ব্যাকটেরিয়া মুরগির দেহে প্রবেশ করে রক্তের সাথে মিশে এক প্রকার বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং রক্ত চলাচলের সাথে মিশে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। সকল বয়সের মোরগ-মুরগির এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

আক্রান্ত মুরগির মল দ্বারা মুরগির খাদ্য ও পানি দূষিত হয় এবং রোগ ছড়িয়ে পড়ে। বন্য পাখী, কুকুর , বিড়াল, ইত্যাদি প্র্রাণীর দ্বারাও এ রোগ এক জায়গা থেকে অন্য যায়গায় বিস্তার লাভ করে। বাজার থেকে রোগাক্রান্ত মোরগ-মুরগি কিনে আনলেও এ রোগ হয়ে থাকে।

এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর মোরগ-মুরগি খেতে চায়না, পালকগুলো খসখসে হয়ে যায়, চেহারায় অবসন্ন নেমে আসে ও রক্তশূন্য মনে হয়ে । মোরগ-মুরগির পিপাসাও বেড়ে যায়। পায়খানার রং সবুজ এবং সাদা ও ফেনাযুক্ত মনে হয়। চলাফেরা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এক জায়গায় দাড়িয়ে ঝিমাতে থাকে এবং অল্প সময়ের মধ্যে মারা যায়।

রক্ত আমাসয় বা ককসিডিওসিস ঃ এ রোগ ইমেরিয়া নামক এক প্রকার পরজীবি দ্বারা হয়ে থাকে। মোরগ মুরগির অন্ত্রের মধ্যে এই রোগ বিস্তার লাভ করে এবং হজম করার শক্তি ধীরে ধীরে নষ্ট করে দেয় । এই রোগ মোরগ-মুরগির মলের সাহায্যে বিস্তার লাভ করে। এই রোগের পরজীবি মুরগির অন্ত্রে প্রচুর ডিম দিয়ে থাকে। এক চা চামচ মলে প্রায় ৭০ লক্ষ ডিম থাকতে পারে। রোগাক্রান্ত মুরগির মল ভিজা মাটিতে পড়লে এ রোগের ডিম দীর্ঘ সময় জীবন্ত থাকে ও কোন রকমে অন্য কোন সুস্থ্য মুরগির পেটে খাবারের সাথে প্রবেশ করতে পারলে পুনঃ রোগ বিস্তার শুরু করতে পারে।

এ রোগে আক্রান্ত হলে মোরগ-মুরগি ঝিমাতে থাকে। চোখ বন্ধ করে রাখে ও গায়ের পালক ঝুলে পড়ে। পায়খানার সাথে রক্ত মিশানো আম পড়তে থাকে । খাবার খেতে চায়না কারণ খাদ্য হজম না হওয়ায় খাদ্যথলি পূর্ন থাকে।

ইনফেকসাস ব্রংকাইটিসঃ এই রোগের জীবানু একপ্রকার ভাইরাস। এই রোগ সংক্রামক ও মারাত্মক ছোঁয়াছে প্রকৃতির । সাধারণত ঃ শ্বাস যন্ত্রই এই রোগে আক্রান্ত হয় ।

একটু বয়স্ক মোরগ-মুরগির এই রো্গ দেখা দেয়। তবে সকল জাতের মোরগ মুরগিরই এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। বছরের সব সময়ই এই রোগ হয়ে থাকে। এই রোগের জীবানু দ্বারা শ্বাসযন্ত্র আক্রান্ত হওয়ার ফলে নানা ধরণের লক্ষন দেখা যায়- যেমন ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস , কফ হাঁচি , নাক দিয়ে রক্ত মিশ্রিত শেস্মা পড়ে, হা করে নিশ্বাস নেয় এবং ঠোট দিয়ে পানি পড়ে। রক্ত মিশ্রিত কফ ট্রাকিয়া ও ল্যরিংসের পথ বন্ধ করায় শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। সেই কারনে মাঝে মাঝে আক্রান্ত পাখীকে প্রচন্ড জোরে মাথা ঝাকানোর সাথে সাথে গড় গড় বা ফিস ফিস শব্দ করতে দেখা যায়।

গামবোরো রোগের টীকা ঃ গামবোরো রোগকে ইনফেকস্স বার্সাল ডিজিজ ও বলা হয়। সাধারণত ৩-৮ সপ্তাহ বয়সের মোরগ -মুরগি এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। আক্রান্ত মোরগ -মুরগির কুচকানো পালক, অবসন্নতা, ময়লা যুক্ত পায়ুস্থান, উচ্চ তাপমাত্রা, কাঁপুনি ও পানির মত ডায়রিয়া এ রোগের প্রধান লক্ষন । এ রোগের ভ্যাকক্সিন এন্টিনিউয়েটেড ও লাইভ আকারে পাওয়া যায়। প্যারেন্ট মুরগির টীকা প্রদান করতে হয়। বয়স্ক প্যারেন্ট মুরগির কিল্ড ভ্যাকক্সিন প্রদান করতে হয়।

৮.১ মোরগ-মুরগির রোগসমূহ রোগের কারনসমূহ রোগ বিস্তারের মাধ্যম সমুহ ঃ

রোগের কারণসমূহ ঃ

* সুষম খাদ্যের অভাব।
* সীমাবদ্ধ স্থানে নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে অতিরিক্ত হাঁস-মুরগির অবস্থান।
* অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান বা পরিবেশ।
* রোগ সৃষ্টিকারী অনুজীবাণু, জীবাণু, পরজীবী ছত্রাক ইত্যাদির আবির্ভাব।
* রোগজীবাণূ বিষয়ে অসতর্কতা, অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা।
*দুষিত ও ভেজা খাদ্য ।

রোগ বিস্তার প্রক্রিয়া ঃ

অসুস্থ হাঁস-মুরগির মল,কফ, সর্দি, ক্ষত হতে বের হতে হওয়া রক্ত ও পূজঁ ইত্যাদির মাধ্যমে সূস্থদেহে রোগ বিস্তার লাভ করে।

(ক) পানি ঃ কৃমির ডিম অসুস্থ হাঁস-মুরগির শরীর থেকে ছড়িয়ে পড়া পালক, ময়লা বিভিন্ন প্রকার জীবানু অনুজীবাণু ইত্যাদি দ্বারা দুষিত পানির মাধ্যমে রোগ বিস্তার লাভ করে।

(খ) বাতাসঃ দূষিত বাতাসের মাধ্যমে অণূজীবাণূ ও শ্বাসযন্ত্রে রোগ জীবাণূ বিস্তার লাভ করে ।

(গ) মাটি ঃ অনেক রোগ অনুজীবি ও কৃমির ডিম ভেজা মাটির মধ্যে অনেককাল পর্যন্ত সক্রিয় থাকে। পরিচর্যাকারী দূষিত মাটি মাড়িয়ে ঘরে ঢুকলে পায়ে পায়ে ঐ জীবাণূ মুরগির ঘরে বিস্তার লাভ করতে পারে।

(ঘ) সংস্পর্শ ঃ রোগাক্রান্ত হাঁস-মুরগি বা মুরগি পালকের সংস্পর্শে থেকে সংক্রামক রোগের জীবাণু সংক্রমিত হয়। হ্যাচারিতে অসুস্থ মুরগির ডিম থেকেও এ সমস্ত রোগ বিস্তার লাভ করতে পারে।

(ঙ) বাহক ঃ অনেক সময় সূস্থ হাঁস-মুরগি নিজে অসুস্থ না হয়ে রোগের বাহক হিসাবে কাজ করে। মানুষ বা অন্য কোন প্রানী, খামারের সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি রোগের বাহক হিসাবে কাজ করতে পারে। এজন্য খামারে হাঁস-মুরগির চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা উত্তম । মনে রাখা উচিত অসুস্থ হাঁস-মুরগি চিকিৎসার পর পূর্বের মত উৎপাদনশীল থাকে না।

৮.২ খামরের জীব-নিরাপত্তা ঃ

নিম্নে বর্নিত বিষয়গুলো বিবেচনা করলে খামারে সঠিকভাবে রোগ জীবানু প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা যাবে।

* প্রতিপালন পদ্ধতি ও উপযোগিতানুসারে মুরগির ঘর/শেড নির্মিত হতে হবে।
* বয়স ও উপযোগিতা অনুসারে নির্ধারিত নিয়মে খাদ্যের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
* বয়স ,উপযোগিতা এবং সংখ্যানুপাতে ঘরে থাকার স্থান দিতে হবে।
* বয়স উপযোগিতা ও হাঁস-মুরগির সংখ্যানুপাতে খাদ্যের পাত্র, পানির পাত্র , ডিমপাড়ার স্থান দিতে হবে।
* ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাস চলচলের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
* সপ্তাহে নির্ধারিত দিনে হাঁস-মুরগির বয়স লিঙ্গ ও উপযোগিতা অনুসারে নমুনা ওজন গ্রহণ করতে হবে।
* বয়স ,লিঙ্গ ও উপযোগিতা অনুসারে ওজন নিয়ন্ত্রন করা প্রয়োজন।
* পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
* ঘরে বা মুরগির দেহে উকুনের উপদ্রব বন্ধ করতে হবে।
* লিটার প্রথায় হাঁস-মুরগি পালন করলে লিটারের পরিচর্যা করতে হবে।
* খাদ্য ও পানি দেওয়ার সময় হাঁস-মুরগি আচরণ কিছুক্ষণ লক্ষ রাখতে হবে।
* পরিচর্যাকারী স্বাস্থ্যপ্রদ ও পরিস্কার পিরচ্ছন্ন অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করতে হবে।
* মুরগির ধকল বা পীড়ন সৃষ্টি হয় এমন ব্যবস্থা বা পরিবেশ কখনও তৈরি করা যাবে না।
* খামারে পরস্পর শেডের মধ্যে নিদির্ষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে শেড নির্মান করতে হবে।
* বৎসরে অন্ততঃ ১ বার এবং নতুন পালের হাঁস-মুরগি পরিবর্তনের সময় সমস্ত ঘর, ঘরের সরঞ্জাম যন্ত্রপাতি ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত করা আবশ্যক।
* ঘরে ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা পর্যাপ্ত রাখা আবশ্যক।
* খামারের অঙ্গিনার মধ্যে পোষা বা বন্য প্রাণিপাখী এবং বহিরাগতদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে হবে।
* বিভিন্ন জাত, বয়স ও উপযোগিতা অনুসারে হাঁস-মুরগি সম্পূর্ন আলাদা ব্যবস্থায় প্রতিপালন করা উচিত।
*মৃত হাঁস-মুরগি যথাযথ ব্যবস্থায় সৎকার ব্যবস্থা করা দরকার।
* নিয়মিত ভাবে প্রতিষেধক টীকা ব্যবহার করা দরকার।
* টীকা প্রদানের নিয়মাবলী সঠিকভাবে অনুসরন করা প্রয়োজন।
* বাচ্চা এবং বাড়ন্ত বাচ্চা খামারে জন্য ক্রয়ের পরিচিত , বিশ্বস্ত এবং রোগমুক্ত হ্যাচারী বা খামার থেকে ক্রয় করা প্রয়োজন।
* কোন প্রকৃতি জীবানূণাশক ব্যবহার করা হয় এবং ব্যবহার পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে।
* হ্যাচারী উপজাতসমূহ অপসারন করার প্রক্রিয়া স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে করতে হবে।
* হাঁস-মুরগির পায়খানা এবং লিটার অপসারণ করার প্রক্রিয়া স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে করতে হবে।
* খামারের কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা অবলোকন, পরিদর্শণ, অনুসরন, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করার পদ্ধতি গুলো যথাযথ ভাবে পালন করতে হবে।
* খাদ্যের পুষ্টিমান যথাযথ থাকতে হবে।
* খাদ্যের উৎস ও প্রস্তুত পদ্ধতি স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া প্রয়োজন।
* পানির উৎস স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া প্রয়োজন।

৮.৩ টীকা বীজ ব্যবহারের সতর্কতা , টীকা প্রদান কর্মসূচী, টীকা প্রদানের মধ্যমে আত্ম কর্মসংস্থান ঃ

* টীকা ব্যবহারের পর অতিরিক্ত টীকা পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা জীবানুনাশক দ্বারা নষ্ট করে ফেলতে হবে।
* কেবলমাত্র সুস্থ ও সবল বাচ্চা /মুরগিকে টীকা দিতে হবে।
* টীকা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন- সিরিঞ্জ, সুঁচ , বিকার ইত্যাদি পানিতে ফুটিয়ে জীবানুমুক্ত করতে হয়। কোন ক্রমেই জীবানুমুক্ত করার জন্য জীবানুনাশক ব্যবহার করা যাবে না।
* লাইভ ভাইরাস ভ্যাকসিন চোখে ড্রপ দেওয়ার সময় নীচে কাগজ বিছিয়ে নেওয়া ভালো। অসাবধানতাবসত টীকা বীজের ফোঁটা কাগজে পড়তে পারে । পরবর্তীতে কাগজ পুড়িয়ে ফেলতে হয়।
* বাচ্চা সংগ্রহের সময় প্যারেন্ট মুরগির কি কি টীকা প্রদান করতে হয় তা জানতে হবে।

টীকা প্রদান কর্মসূচী ঃ

বয়স	রোগের নাম	ভ্যাকক্সিনের নাম	টীকা প্রদারেন পদ্ধতি
১ দিন	মারেক্স রোগ	মারেক্স ভ্যাকসিন	চামড়ার নীচে ইনজেকশণ
২ দিন	গামবোরো রোগ	গামবোরো ভ্যাকসিন(লাইভ)	চোখে ফোঁটা (প্যারেন্ট মুরগির টীকা প্রদান করা না থাকলে)
৩-৫ দিন	রানীক্ষেত রোগ	বি.সি.আর ডি.ভি.	দুই চোখে ফোঁটা (প্যারেন্ট মুরগির টীকা প্রদান করা থাকলে ৭-১০ দিন বয়সে)
৭ দিন	ইনফেকসাস ব্রংকাইটিস	আই. বি.	চোখে ফোঁটা
১০-১৪ দিন	গামবোরো রোগ	গামবোরো ভ্যাকসিন	এক চোখে ফোঁটা
২১-২৪ দিন	রানীক্ষেত রোগ	বি.সি.আর ডি.ভি.	দুই চোখে ফোঁটা
২৪-২৮ দিন	গামবোরো রোগ	গামবোরো ভ্যাকসিন	এক চোখে ফোঁটা
৩৫ দিন	মুরগির বসন্ত	ফাউল পক্স ভ্যাকসিন	চামড়ার নীচে সুচ ফুঁটিয়ে
৬০ দিন	রানীক্ষেত রোগ	বি.সি.আর ডি.ভি.	চামড়ার নীচে /মাংসে ইনজেকশন
৮০-৮৫ দিনে	কলেরা	ফাউলকলেরা ভ্যাকসিন	চামড়ার নীচে /মাংসে ইনজেকশন
১১০-১১৫দিন	কলেরা	ফাউলকলেরা ভ্যাকসিন	চামড়ার নীচে /মাংসে ইনজেকশন
১৩০ -১৩৫ দিন	ইনফেকসাস ব্রংকাইটিস	সমন্বিত টীকা	চামড়ার নীচে /মাংসে ইনজেকশন
১৩০-১৩৫দিন	কৃমি	কৃমিঔষধ	খাদ্য /পানির সাথে।

*খাদ্যের সাথে ৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত Cocidiostat ব্যবহার করতে হয়।

ব্রয়লার মুরগীর জন্য মারেক্স , গামবোরো ও রানীক্ষেত রোগের ভ্যাকসিন ব্যবহার করতে হয়। এলাকায় অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব না থাকলে ভ্যাকসিন ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না । এ বিষয়ে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ অফিসে যোগাযোগ করা বাঞ্ছনীয় ।

৮.৪ টীকা প্রদান কর্মসূচী ফলপ্রসু না হওয়ার কারন সমূহঃ

* টীকাবীজ সঠিকভাবে সংরক্ষিত না থাকলে
*ব্যবহারের সময় মেয়াদ উর্ত্তীন হলে।
* প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের নির্দেশাবলী সঠিকভাবে পালন না করা হলে।
* সাত দিন বা তার কম সময়ের মধ্যে অন্য কোন রোগের টীকা প্রদান করলে ।
* দুপুর বেলা প্রচন্ড গরমের মধ্যে টীকা প্রদন করা হলে।
* টীকা বীজ সরাসরি সূর্যকিরনে থাকলে।
* টীকা বীজ তরলকৃত করার পর নির্ধারিত সময়ের পরে ব্যবহার করলে।
* ব্যবহৃত পানি পরিশুদ্ধ না হলে।
* ভ্যাকসিন গুলানোর জন্য নির্দিষ্ট ডাইলুয়েন্ট ব্যবহার না করলে।
* টীকা বীজ শরীরের মধ্যে পরিমাণমত প্রবেশ না করলে ।
* নির্দিষ্ট ষ্ট্রেইন এর টীকাবীজ ব্যবহার না করলে।
* টীকা প্রদানকারী পরিচ্ছন্ন ও জীবানুমুক্ত না থাকলে।
* টীকা প্রদানের সময় টীকা প্রদানের সরঞ্জাম জীবানুমুক্ত ও পরিশুদ্ধ না থাকলে।
* গামবোরো রোগে অথবা মাইকো প্লাজামা রোগে আক্রান্ত হলে ।

৮.৫ লিটার ও মৃত মুরগি অপসারন প্রক্রিয়া, কম্পোজিট ও কম্পোষ্টপদ্ধতি, বায়োগ্যাস পান্ট পদ্ধতিঃ

* খামারের ভিতর পৃথক স্থান থাকলে বড় পুকুরের মত গর্ত করতে হয়।
* সদ্য মল খাঁচা ও মাঁচার নীচে পানি স্প্রে করে ধুয়ে পুকুরে মত গর্তে ফেলে দিতে হয়।
* এই প্রথায় ময়লা পানি ও মুরগির মল প্রকত্রে পুকুরের মধ্যে জমা হয়।
* কম্পোজড করে জৈব সার জমিতে ব্যবহার করা যায়।
* মাটির ৫/৬ ফুট গভীরে এন এরাবিক অবস্থায় ফারমেনটেশন করে গবাদি প্রাণির খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
* মুরগির বিষ্ঠা দ্বারা বায়োগ্যাস তৈরী করে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা যায়।
* লিটার সরাসরি জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
* শুকিয়ে সার ও খাদ্য হিসাবে সংরক্ষন করা যায়।
* লিটার মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়।
* লিটার মৃত মুরগির সাথে কম্পোজড করে সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

কম্পোষ্টিং পদ্ধতিতে মুরগির বিষ্ঠা অপসারন প্রক্রিয়া

কম্পোষ্টিং একটি নিয়ন্ত্রিত জৈবপচন প্রক্রিয়া ,যা জৈব পদার্থকে স্থিতিশীল দ্রব্যে রুপান্তর করে। যে সকল অনুজীব পচনশীল পদার্থকে তাদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার কবে, সে সকল অনুজীবের উপর এ প্রক্রিয়া নির্ভশীল। কম্পোষ্টিং প্রক্রিয়া গন্ধ ও অন্যান্য বিরক্তিকর সমস্যা সম্বলিত পদার্থকে স্থিতিশীল গন্ধ ও রোগ জীবানু, মাছি ও অন্যান্য কীট পতঙ্গের প্রজননের অনুপযোগী পদার্থে রূপান্তরীত করে।

যে সকল মৌলিক পরিবর্তনশীল উপাদান পচন ক্রিয়া কার্যকারীতা প্রভাবান্বিত করে সে গুলো হচ্ছে ঃ

- বাতাস প্রবেশ করানোর মাধ্যমে অক্সিজেন সরবরাহ ।
- জৈব পদার্থে যে নাইট্রোজেনের অংশ থাকে সাধারণত ঃ একে সিঃএন (কার্বন/নাইট্রোজেন) অনুপাত হিসাবে প্রকাশ করা হয়।
- সর্বাপেক্ষা অনুকূল আর্দ্রতা ৪০%-৬০%।
- তাপমাত্রা ঃ কম্পোস্টিং নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে পরিবর্তনশীল তাপমাত্রা বিভিন্ন ধাপ অক্রিম করেঃ থার্মোফিলিক ধাপ (৪৫ ডিগ্রী -৬০ ডিগ্রী সেঃ) একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। কেননা এই তাপমাত্রায় রোগ জীবানু এবং ঘাসের বীজ ধ্বংস হয়।
- এসিডিটি বা অম্লত্ব ঃ সর্বাপেক্ষা অনূকূল মান ৫.৫-৮.০ ।

কম্পোস্ট ঃ

কম্পোস্ট হলো পচাঁ জৈব উপকরণের এমন একটি মিশ্রণ যা উষ্ণ আর্দ্র পরিবেশে অনুজীব কর্তৃক বিশিষ্ট হয়ে উদ্ভিদের সরাসরি গ্রহন উপযোগী পুষ্টি উপকরণ সরবরাহ করে।

বাক্স পদ্ধতিতে কম্পোস্টিং

নিম্ন লিখিত পদ্ধতিতে কম্পোস্ট বাক্স নির্মান করা যায় ঃ

- চৌকোনাকৃতি ছিদ্রযুক্ত ইটের দেয়াল দিয়ে বাক্স তৈরী করা হয়।
- দেয়ালের গাযে ৪বর্গ ইঞ্চি মাপের অসংখ্য ছিদ্র থাকে।
- বাক্সের তলায় বিশেষভাবে নির্মিত ১/২ ইঞ্চি পুরু ছিদ্র বিশিষ্ট পি.ভি.সি. সীট বা লোহার রড বা অন্য কিছু দিয়ে তৈরী জালি মেঝে থেকে ৬ ইঞ্চি উপরে বসানো হয় । ফলে কম্পোস্ট মিশ্রণে বাতাস প্রবেশ ছাড়াও অতিরিক্ত পানি ঝরে পড়ে।
- চার ইঞ্চি ব্যাসের সাড়ে চারফুট লম্বা অনেকগুলো প্লাস্টিক পাইপের প্রয়োজন হয়।
- এ সকল পাইপের গায়ে ১ ইঞ্চি ব্যাসের অনেকগুলো ছিদ্র থাকে।
- এই পাইপগুলো প্রতি দেড় ফুট পর পর বাক্সের তলা থেকে খাড়াভাবে বসানো হয়।
- কম্পোস্ট মিশ্রণ দিয়ে বাক্সটি ভরার পর বাক্সের চারদিক দিয়ে কম্পোস্ট মিশ্রণের মধ্যে বাতাস প্রবেশ ছাড়াও পাইপের ভেতর দিয়ে বাতাস আদান প্রদানের মাধ্যমে কম্পোস্টিং কার্য্যক্রম সম্পাদিত হয়।
- এই পদ্ধতিতে বাক্সের মধ্যে কম্পেটাস্টিং প্রক্রিয়া ৪০ দিনে সম্পন্ন হয়।
- পরিপক্কতা বা ম্যাচিউরিং এর জন্য আরও ১৪ দিন সময়ের প্রয়োজন হয়।
- কম্পোস্ট বাক্স অবশ্যই ছাউনীর নীচে স্থাপন করতে হবে।

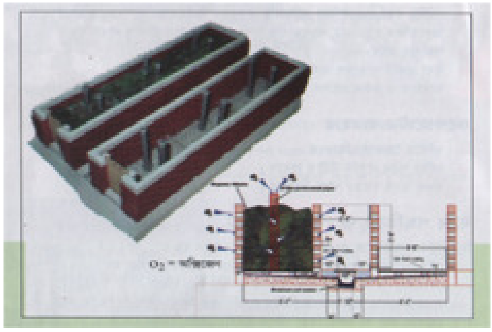

চিত্র-১৭ কম্পোস্টিং বাক্স তৈরি করণ

চিত্র ১৮ কম্পোস্টিং উপকরণ মিশ্রিত করণ

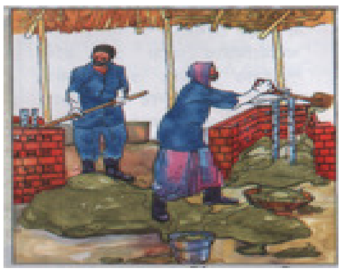

চিত্র ১৯ কম্পোস্টিং বাক্সে উপকরণ দেয়া

চিত্র ২০ কম্পোস্টি বাক্সে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা রক্ষার্থে পানি দেয়া।

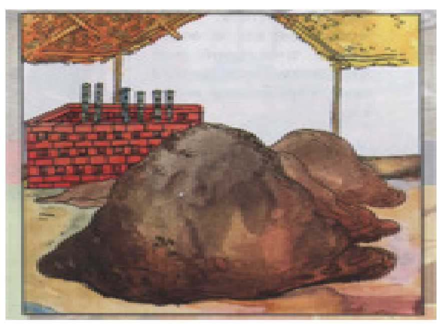

চিত্র ২১ কম্পোস্টিং পরিপক্ক হওয়ার পর উপকরণসমূহ বের করে নেওয়া।

চিত্র ২২ পরিপক্কতার পর চালুনে চালা এবং বস্তা জাত করা করা।

চিত্র ২৩ কম্পোস্টিং সার শাকসব্জি খেতে ব্যবহার

মডিউল -৯

হাঁস-মুরগির খাদ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনাঃ

৯.১ খাদ্যের উপদান সমূহ ও প্রকার ভেদঃ

হাঁস-মুরগির খামার স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য আর্থিক ভাবে লাভবান হওয়া ও মূল্যবান আমিষ খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা । এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য খামার ব্যবস্থাপনার প্রধানতম অংশ খাদ্য ও পুষ্টি সরবরাহ করা ।

* খামার পরিচালনার জন্য মোট খরচের সিংহভাগ শুধু খাদ্যের জন্য খরচ হয়।

* এই খরচের শতকরা ৭০ ভাগের অতিরিক্ত হলে খামারে লোকসারনের হার বৃদ্ধি পায়।

* খামার ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা কালে খাদ্য খরচ শতকরা ৬০ হমে ৭০ ভাগের মধ্যে সীমিত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

এ কারনে খাদ্য ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে প্রছন্ন ধারণা অর্জন খামার ব্যবস্থাপনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন।

* খাদ্য এমন এক বস্তু যার অভাবে হাঁস-মুরগি সহ কোন প্রানী বাঁচতে পারে না।

* খাদ্য বস্তু প্রানীর দেহের চালিকা শক্তি

* খাদ্যের বিভিন্ন পুষ্টি উপদানের সাহায্যে প্রাণীদেহে ও দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠিত হয়।

* প্রতিদিনের খাদ্য দেহকে সবল রাখে তেমনি দেহকোষ গঠন ও নবায়ন করে।

* খাদ্য হাঁস-মুরগির পালক গঠন করে ও নবায়ন করে।

* খাদ্য মাংস ও ডিম গঠিত হয়।

* খাদ্য মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করে।

* খাদ্যের পুষ্টি উপপাদান বিভিন্ন প্রকার রোগের আক্রমণ থেকে হাঁস-মুরগিকে রক্ষাকরে।

* খাদ্য দেহের ভিতর বিভিন্ন গ্রন্থি হতে নিঃসৃত রস উৎপাদন করে।

খাদ্যের উপদান সমূহ

যে সমস্ত খাদ্য উপকরণের মধ্যে যে পুষ্টি উপাদান অধিক পরিমানে থাকে তাকে সে জাতীয় খাদ্য বলে। যেমন. (ক) শর্করা জাতীয় খাদ্য (ভুট্টা, গম, কাওন, চাউলের কুঁড়া, গমের ভুষি ইত্যাদি)।

(খ) আমিষ জাতীয় খাদ্য (সয়াবিন মিল, তিলখৈল, শুটকিমাছ, মিটমিল ইত্যাদি।

(গ) চর্বি জাতীয় খাদ্য (এনিমেল ফ্যাট , হাঁস-মুরগরি তৈল, ভেজিটেবল অয়েল সার্কলিভার ওয়েল ইত্যাদি।

(ঘ) ভিটমিন জাতীয় খাদ্য (শাকসব্জি ও কৃত্রিম ভিটামিন)

(ঙ) খনিজ জাতীয় খাদ্য (ঝিনুক , ক্যালশিয়াম ফসফেট ে,রকসল্ট , লবন ইত্যাদি)।

(চ) পানি।

৯.২ শর্করা জাতীয় খদ্য, আমিষ জাতীয় খাদ্য , চর্বিজাতীয় খাদ্য

দেহের ভিতর খাদ্য পরিপাক কালে শর্করা উপাদান শ্বেতসার ও গুকোজে বিশেষিত হয় এবং দেহের তাপ উৎপাদনের জন্য বিপাকীয় কার্যক্রমের সময় শক্তি সরবরাহ করে।

* অতিরিক্ত শ্বেতসার হাঁস-মুরগির তলপেট, কলিজা ও মাংসপেশীর টিসুর ভিতর চর্বি আকারে জমা হয় এবং প্রয়েআজনে বিপাকীয় কার্যক্রমের জন্য শক্তি সরবরাহ করে।

* শর্করা জাতীয় খাদ্য কার্বন হাউড্রোজেন ইত্যাদি মৌলিক উপাদান দ্বারা গঠিত জৈব যৌগিক পদার্থ।

* শর্করা জাতয়ি খাদ্য ২ প্রকার

দানাদার ঃসকল প্রকার দানাদার খাদ্যশস্য যেমন, ভুট্টা গম , যব,কাওন, সরগম, চাউল ইত্যাদি।

আঁশ ঃ সকল প্রকার দানাদার খাদ্যের উপজাত যেমন চাউলের কুঁড়া, গমের ভূষি, তোপিওকা, ভুট্টার গুটেন, কাসাভা ইত্যার্দি।

* হাঁস-মুরগির খাদ্যের বেশীর ভাগ শর্করা পুষ্টি উপাদান যেমন দানাদার শতকরা ৪০ হতে ৬০ ভাগ এবং উপজাত অংশ শতকরা ১০ হতে ৩০ ভাগ ব্যবহার করা হয়।

খ) আমিষ জাতীয় খাদ্য ঃ

* হাস-মুরগির দেহ কোষ আমিষ পুষ্টি উপাদান দ্বারা গঠিত।

* দেহের ক্ষয় প্রাপ্ত কোষ গঠন ও নবায়নের জন্য আমিষ প্রয়োজন হয়।

* দেহের পালক আমিষ উপাদান দ্বারা গঠিত।

* দেহের বিভিন্ন গ্রন্থি হতে উৎসারিত রসের মধ্যে এই উপাদান থাকে।

*রক্ত আমিষ উপাদান দ্বারা গঠিত।

* ডিম আমিষ উপাদান দ্বারা গঠিত।

* দৈনন্দিন খাদ্যের সাথে গ্রহনকৃত আমিষ হাঁস-মুরগির দেহের ক্ষয়পুরন,পুষ্টি সাধন ও শারীরিক বৃদ্ধি ঘটায়।

উপাদান ও এমাইনো এসিডঃ

আমিষ খাদ্য খাওয়ার পর হাঁস-মুরগির পাকস্থলিতে বিশেষিত হয় ও ২২ প্রকার এমাইনো এসিড গঠন করে।

*যে আমিষ খাদ্যে ২২ প্রকার এমাইনো এসিড থাকে না তাকে হাঁস-মুরগির জন্য অসম্পূর্ন আমিষ খাদ্য বলে।

* খাদ্যে এমাইনো এসিডের ঘাটতি অর্থাৎ আমিষের ঘাটতি।

* কিছু কিছু এমাইনো এসিড আছে যা পাকস্থলিতে কম বিশেষিত হয়, এই জাতীয় এমাইনোএসিডকে প্রয়োজীয় এমাইনো এসিড বলে।

পাঁচটি এমাইনো এসিডের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়ার জন্য খাদ্যের সাথে কৃত্রিম এমাইনো এসিড সংযোজন করতে হয়। এই সমস্ত এমাইনো এসিডকে সংকটজনক প্রয়োজনীয় এমাইনো এসিড বলে।

সমস্ত প্রকার সংকট জনক এমাইনো এসিড প্রয়োজনীয় এমাইনো এসিড কিন্তু সব প্রয়োজনীয় এমাইনো এসিড সংকট জনক নয়।

প্রানীজ ও উদ্ভিদ জাতীয় খাদ্য।
* যে সমস্ত আমিষের উৎস প্রানী তাকে প্রানীজ আমিষ বলে
* যে সমস্ত আমিষের উৎস উদ্ভিদ তাকে উদ্ভিদ জাতীয় আমিষ বলে।
* সাধারণত প্রাণীজ আমিষ ও উদ্ভিদ জাতীয় আমিষ একত্রে এমাইনো এসিডের সম্পূর্নতা পূরন করে।
* প্রানীজ আমিষ যেমন শুটকি মাছ , শুটকি মাংস মিট ও বোনমিল, ফিদার মিল, ব্লাডমিল, লিভার মিল, প্রোটিন কনসেনট্রেড ইত্যাদি।
* প্রাণীজ আমিষের অভাবে হাঁস-মুরগির খাদ্যে উদ্ভিদ জাতীয় আমিষের সাথে বিভিন্ন প্রকার এমাইনো এসিড মিশ্রিত করে সম্পূর্ন আমিষ তৈরী করা যায় । উদ্ভিদ জাতীয় আমিষ যেমন সায়াবিন মিল, তিলখৈল , তৈল বীজের খৈল, তুলা বীজের খৈল, সবুজ শাকসব্জি , ডাকউইড, এ্যাজোলা ইত্যাদি।

খাদ্যে আমিষের হার নির্ধারণ পদ্ধতিঃ
ব্রুডিং থেকে শুরু করে ডিম পাড়ার পুর্ব পর্যন্ত কম বেশী দৈনিক গড় আমিষ গ্রহনের পরিমান স্থিতিশীল রাখার জন্য যখন কম খাদ্য খায় তখন খাদ্যে আমিষের হার বেশী থাকে এবং বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্য খাওয়ার পরিমান বৃদ্ধির কারণে খাদ্যে আমিষ ব্যবহারের হার কমানো হয়।
* ডিম পাড়তে শুরু করার পূর্বে বয়স ও জাত অনুসারে পুলেটের নির্ধারিত ওজন থাকা প্রয়োজন । বাড়তি বয়সে প্রতিসপ্তাহে এক ভাগ আমিষ কমানো হলে বৎসরে শতকরা একটি ডিম বেশী হয়। এক দিন করে যৌন পরিপক্কতার উন্নতি হয়।
* প্রতি সপ্তাহে শতকরা ১ ভাগ হারে আমিষ ব্যবহারের পরিমাণ কমাতে হয় , যতক্ষন না সার্বনিম্ন পরিমান শতকরা ১৫ ভাগ হয়।

৯.৩ ভিটমিন ও খনিজ লবন এবং পানি।
ভিটামিনের উৎস ঃ

- বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ।
- সবুজ শাকসব্জি ও রঙিন ফলমূল।
- পাকস্থলিতে ক্ষুদ্র জীবাণুর কার্যক্রমে কিছু ভিটামিন উৎপন্ন হয়।
- খাদ্যের কিছু প্রো ভিটামিন হাঁস-মুরগির দেহে খাঁটি ভিটামিনে রূপান্তর হয়।
- ভিটামিন সুনিদির্ষ্ট রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ বিধায় কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করা যায়।

ভিটামিনের শ্রেনী বিভাগ ঃ

- দ্রাব্যতার ভিত্তিতে ভিটামিন - ২ শ্রেনীতে ভাগ করা হয়।

ক) পানিতে দ্রবনীয় ভিটামিন যেমন ঃ- বি গোষ্ঠি ও সি
খ) চর্বিতে দ্রবনীয় ভিটামিন যেমন ঃ- এ,ডি, ই,ও কে (মুরগির ভিটামিন ডি-৩ প্রয়োজন হয়)।

খনিজ জাতীয় খাদ্য
ঘাঁস-মুরগির জন্য খনিজ পর্দার্থের ভুমিকা অপরিসীম । বিভিন্ন খনিজ পদার্থ বিভিন্ন মাত্রায় খাদ্যের সাথে ব্যবহার করা হয়। অনেক প্রকার খনিজ পদার্থ খাদ্যের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে উপস্থিত থাকে যা স্বতন্ত্র ভাবে খাদ্যের সাথে ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।
প্রয়োজনের ভিত্তিতে খনিজ পর্দার্থকে ২ দলে ভাগ করা হয় ।
(১) অধিক পরিমাণে প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ। যেমন ঃ ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সালফার, পটাসিয়াম,সোডিয়াম, ক্লোরাইড,ও ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি।
(২) স্বল্প পরিমাণে প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ। যেমন ঃ আয়রন, কপার, আয়োডিন,কোবাল্ট, জিংক, ম্যাংগানিজ ও সেলেনিয়াম ইত্যাদি।

পানিঃ

* যে উপাদান দেহের কোষ গঠন করে তাকে খাদ্য বলে । দেহের কোষ গঠনে পানিে ভূমিকা বেশী । দেহকোষে শতকরা ৬০- ৭০ ভাগ পানি থাকে।

* কোন প্রাণী জৈব বস্তু অথবা অজৈব খনিজ জাতীয় খাদ্য না খেয়ে কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারে কিন্তু পানি ছাড়া সামান্য কিছুদিনের বেশী বাঁচে না।

* দেহ থেকে পানির ক্ষয় হয় মলমূত্র ও শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে ।

* অপরদিকে পানি আহরিত হয় পানি পান, রসালো খাদ্য গ্রহণ এবং দেহের ভিতর বিভিন্ন পুষ্টি উপদানের অক্সিডিশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

হাঁস-মুরগির দেহে পানির কাজ

- খাদ্যতন্ত্রের মধ্যে খাদ্য বস্তু নরম ও পরিপাকে সহায্য করে।
- খাদ্যতন্ত্রের মধ্যে পুষ্টি উপাদান তরল করে দেহের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিবহণ করে।
- দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
- দেহ সতেজ রাখে।
- দেহের ভিত্তিতে দুষিত পদার্থ অপসারন করে।
- দেহের গ্রন্থি হতে নিঃসৃত রস, হরমোন,এনজাইম এবং রক্ত গঠনে ভূমিকা রাখে।
- দেহের বেশির ভাগ অংশ পানি দ্বারা গঠিত।
- ডিমের বেশির ভাগ অংশ পানি দ্বারা গঠিত।

দেহের ভিতর বিপাকীয় কার্যক্রমে পানির প্রয়োজনীতা

- খাদ্যবস্তু দেহের ভিতর দাহ্য হয়ে তাপ উৎপাদন করে । এই তাপ দেহের চালিকা শক্তি । দেহের ভিতরে খাদ্যবস্তু দাহ্য হওয়ার প্রক্রিয়াকে বিপাকীয় কাযক্রম বা মেটাবলিক একটিভিটি বলে।
- কোন খাদ্যবস্তুকে যন্ত্রের মধ্যে পোড়ানো হলে তাপ উৎপাদনের জন্য যে শক্তি ব্যবহৃত হয় তাকে ঐ খাদ্যবস্তুর মোট শক্তি বা গ্রস অ্যানার্জি বলে।
- সব খাদ্যবস্তু পোড়ানো হলে সমপরিমান তাপ উৎপাদন হয় না এবং সকল খাদ্য বস্তুতে সমপরিমান শক্তি থাকে না।
- খাদ্যের সব শক্তি দেহের ভিতর বিপাকীয় কাজে ব্যবহৃত হয় না । ব্যবহৃত শক্তির অতিরিক্ত হাঁস-মুরগির পায়খানা প্রসাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়।
- পায়খানা প্রসাবে প্রাপ্ত শক্তি খাদ্যের মোট শক্তি হতে বাদ দিলে দেহের ভিতর বিপকীয় কার্যক্রমে ব্যবহৃত শক্তির পরিমান জানা যায়।
- খাদ্যের বিপাকীয় শক্তি হাঁস-মুরগির জীবন ধারন নির্বাহী কার্য পরিচালনা ও ডিম উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

৯.৪ বিভিন্ন বয়স ও জাত অনুসারে আমিষ ও ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স।

পুষ্টি উপাদানের নাম	ইউনিট	বাচ্চা	পুলেট			লেয়ার			ব্রয়লার	
	শতকরা হার	০-৬ সপ্তাহ	৭-১২ সপ্তাহ	১৩-১৬ সপ্তাহ	১৭-২০ সপ্তাহ	২১- ৪০ সপ্তাহ	৪১-৬০ সপ্তাহ	৬১সপ্তাহের উর্দ্ধে	০-২১ দিন	২২দিনের উর্দ্ধে
১। আমিষ	১০০ কেজি	১৯-২০	১৭-১৮	১৬-১৭	১৫-১৬	১৮-১৯	১৬-১৭	১৫-১৬	২৩-২৪	১৮-১৯
২। ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	১০০ কেজি	৩.০০	৩.০০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০	৩.৫০	৩.০

৯.৫ বিভিন্ন বয়সের মুরগির খাদ্য প্রস্তুত পদ্ধতি

সুষম খাদ্য ঃ

মুরগির জাত, বয়স ও উপযোগিতানুসারে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের সমন্বয়ে তৈরী খাদ্যকে সুষম খাদ্য বলে।

সম্পূর্ন খাদ্য

- সুষম খাদ্যকে সম্পূর্ণ করার জন্য খাদ্যের সাথে বিভিন্ন প্রকার ঔষধ, এনজাইম, এমাইনো এসিড খনিজ ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে খাদ্যের গুণগত মান সংরক্ষন ক্ষমতা বৃদ্ধি ,সুস্বাদু ও খাদ্য রূপান্তর হার বৃদ্দির ব্যবস্থা করা হয়।

(ক) লেয়ার মুরগীর খাদ্য

* বাচ্চার রেশন ঃ **১** দিন হতে ৬ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চার খাদ্য
* গ্রোয়ার রেশন ঃ ৭ সপ্তাহ হতে **২০** সপ্তাহ বয়সের বাচ্চার খাদ্য
* লেয়ার রেশন ঃ **২১** সপ্তাহের উর্দ্ধে ।

উপকরনের নাম (শতকরা হিসাবে)	বাচ্চার রেশন	গ্রোয়ার রেশন	লেয়ার রেশন
ভুট্টা ভাংগা	৫২.৭৫	৫৪.৭৫	৪৭.৭৫
চাউলের কুঁড়া	১৬.০০	২০.০০	১৬.০০
তিলের খৈল	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০
সয়ামিন মিল	১৬.০০	১০.০০	১৩.০০
প্রোটিন /শুটকীমাছের গুড়া	৭.০০	৫.০০	৭.০০
লবন	০.৫০	০.৫০	০.৫০
ঝিনুক চূর্ন		০.২০	০.৮০
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.২৫	০.২৫	০.২৫
সুষম খাদ্য (মোট)	১০০ কেজি	১০০ কেজি	১০০ কেজি

ব্রয়লার মুরগির খাদ্য (ষ্টার্টার)

ক্রমিক নং	উপকরন	পরিমান(কেজি)	শক্তি(ক্যালোরি) কেজি	আমিষ %
১	ভুট্টা	৫১.৯০	১,৭৩৩.৪৬	৪.৭৭
২	চাউলেরকুঁড়া	১১.০০	৩২৩.০০	১.৪০
৩	সয়াবিন মিল	২৬.০০	৭১৫.০০	১১.৪৪
৪	প্রোটিন কনসেনট্রেট	৮.০০	২২১.০০	৪.৮০
৫	সয়াবিন তৈল	২.০০	১৭৯.০০	-
৬	ডি.সি.পি.	০.৫০	-	-
৭	লবণ	০.২০	-	-
৮	মিথিওনিন	০.১৫	-	-
৯	ভিটামিন প্রিমিক্স	০.২৫	-	-
	মোট	১০০.০০	৩,১৭১.৪৬	২২.৪১

ব্রয়লার মুরগির খাদ্য (ফিনিসার)

ক্রমিক নং	উপকরন	পরিমান(কেজি)	শক্তি(ক্যালোরি) কেজি	আমিষ %
১	ভুট্টা		১,৮০১.২৬	৪.৯৬
২	চাউলেরকুঁড়া	১৫.০০	৪৪০.৫৫	১.৯০
৩	সয়াবিন মিল	২০.০০	৫৫০.০০	৮.৮০
৪	প্রোটিন কনসেনট্রেট	৮.০০	২২১.০০	৪.৮০
৫	সয়াবিন তৈল	২.০০	১৭৯.০০	-
৬	ডি.সি.পি.	০.৫০	-	-
৭	লবণ	০.২০	-	-
৮	মিথিওনিন	০.১২	-	-
৯	ভিটামিন প্রিমিক্স	০.২৫	-	-
	মোট	১০০.০০	৩,১৯১.৮১	২০.৪৬

৯.৬ মুরগির খাদ্য বিপনন একটি লাভজনক পেশা ঃ

মুরগি পালনের ৭০ ভাগ খরচই খাদ্য খায়াতে ব্যয় হয়। কম খরচে ভাল খাদ্য প্রস্তুত একটি গুরুত্বপূর্ন কাজ । যে কেহ এই খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে। কিন্তু গুনগতমান সম্পন্ন খাদ্য তৈরী সবাই করতে পারবে না। কারণ এ জন্য সৎ , কর্মঠ ও উত্তম মনের অধিকারী মানুষ হতে হবে। মনে প্রাণে খাদ্য ব্যবসায় উৎসাহী মানুষ হতে হবে। খাদ্যের গুনগত মান সঠিক থাকলে খাদ্যের চাহিদা কখনও কমবে না। বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী প্রকল্পের মাধ্যমে অনেক প্রকল্প এলাকায় সমিতি গঠন করে মুরগি পালন করা হচ্ছে । মুরগি পালন কারীদের মদ্যে থেকেই একজনকে খাদ্য উপকরন ক্রয় , প্রস্তুত ও সরবরাহের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। দেখা গেছে বাজারের বিভিন্ন কোমপানীয় খাদ্য খাওয়ানোর চেয়ে সমিতির মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত খাদ্য খাওয়ালে অনেক ভাল উৎপাদন পাওয়া যায়। এভাবে কোন এলাকায় সমিতি গঠন ছাড়াা ও যদি কেহ নিষ্ঠার সহিত কাজটি করে তবে খাদ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে জীবিকার্জন করাসহ বিত্তবান হওয়া সম্ভব।

মডিউল -১০

তুষ পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগির বাচ্চা উৎপাদন

১০.১ ভূমিকা , বাচ্চা ফুটানোর ডিমের উৎস্য, ডিম বাছাই, ডিম নির্বাচন ঃ

প্রথম চীন দেশে এই পদ্ধতির প্রচলন হয়। বর্তমানে ভারত,ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া,মালয়েশিয়া সহ অনেক দেশে এই পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগির ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদন করা হচ্ছে। দুঃস্থ ও বেকার মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য এই পদ্ধতির প্রচলন করা যায়, একজন মহিলাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা যায়। এভাবে একজন মহিলা মাসে ১৫ হাজার থেকে২০ হাজার টাক পর্যন্ত লাভ করতে পারে।ফুটানো ডিম নিজে উৎপাদন করে কিংবা কন্ট্রাক্ট উৎপাদনকারীর কাছ থেকে ডিম সংগ্রহ করা যাইতে পারে। সংগ্রহকৃত ডিম গুলি বাছাইকরে ভাল গুনগতমানের ডিমগুলো ফুটানোর জন্য নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচনের জন্য মাঝারি আকারের, মাঝারি খোসাযুক্ত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন , ভাংগা বা ফাটা নয় অল্প বয়সের ডিম নির্বাচন করতে হবে।

১০.২ ডিম ফুটানো প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী (হ্যাচিং ডোল তৈরীকরন, হ্যাচিং বেড তৈরীকরন পুটলি বাঁধন ,ডোলে ডিম বসানো ইত্যাদি)ঃ

খুব সহজে এবং কম খরচে এই যন্ত্র তৈরি করা যায় । এই যন্ত্রের ২ টি অংশ থাকে । ডিম বসানোর অংশ এবং বাচ্চা ফুটানোর অংশ। ডিম বসানোর অংশ এই অংশকে ইংরাজিতে সেটার বলে। কাঠের বাতার সাথে হার্ডবোর্ড অথবা বাঁশের চাটাই দ্বারা ২ ফুট ী ২ ফুট এবং ৩ ফুট খাড়া চার কোনা বাক্স তৈরি করতে হবে। বাক্সের উপর দিক খোলা থাকবে বাঁশের চাটাই দিয়ে ১৪ ইঞ্চি চওড়া (ব্যাস) ও ৩০ ইঞ্চি খাড়া গোল ডোল তৈরি করতে হবে্। ডোলের উপড় ও নিচে খোলা থাকবে। বাক্সের ভেতর তলাতে ৬ ইঞ্চি পরিমান তুষ বিছতে হবে। বাক্সের ভিতরে তুষের উপর ডোল বসাতে হবে। ডোল ও বাক্সের মাঝে খালি জায়গা তুষ দিয়ে ভরতে হবে। ডোলের চারদিকে ও তলাতে ৬ ইঞ্চি তুষ থাকবে।বাক্সের মধ্যে দুই বা তার চেয়ে বেশি ডোল বসানোর জন্য বাক্সের আকার বড় করতে হবে।

-২ ফুট প্রশস্ত , ৪ ফুট লম্বা ও ৩ ফুট খাড়া বাক্স ২ টি ডোলা বসানো যাবে ।

-৪ ফুট প্রশস্ত , ৪ ফুট লম্বা ও ৩ ফুট খাড়া বাক্সে ৪টি ডোল বসানো যাবে।

-৪ ফুট প্রশস্ত ,৬ ফুট লম্বা ও ৩ ফুট খাড়া বাক্স ৬ টি ডোল বসানো যাবে। প্রতিটি ডোলের মধ্যে ৪০০-৫০০টি ডিম বসানো যাবে। ডোলে আকার বড় করলে সেই অনুপাতে বাক্সের আকার বড় করতে হবে।

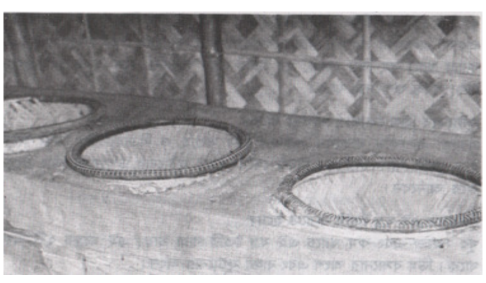

চিত্র ২৪ বাক্সের ভিতর ঢোল প্রস্তুত করণ

বাচ্চা ফুটানোর অংশ এই অংশকে বাচচা ফুটানোর বিছানা এবং ইংরেজিতে হ্যাচার বেড বলে। ১৮ দিন ডোল থেকে ডিম বের করে বিছানার উপর বসাতে হয়। এখানে ডিম থেকে বাচআ ফুটে বে হয়। একহাজার ডিম বসানোর জন্য ৪২ ইঞ্চি লম্বা ও ২৪ ইঞ্চি চওড়া বিছানা প্রয়োজন হয়। হার্ড বোর্ডের চারদিকে কাঠের বাতা দিয়ে এই বিছানা তৈরি করা যায়।

- বাচ্চা পড়ে যাওয়া ঠেকানোর জন্যে বিছানার বারদিকে কাঠের তক্তা দিয়ে ৬ ইঞ্চি বেড়া তৈরি করতে হয়।
- বিছানার উপরে ২/৩ ইঞ্চি পুরু করে তুষ বিছাতে হয় ।
- কাঠের বা বাঁশের খুটির সাহায্যে এই বিছানা বহুতলা করা যায়।

চিত্র ২৫ বাচ্ছা ফুটানোর বিছানা

ডিম ফুটানো ঘর ঃ

-কম খরচে বাঁশের চাটাই দিয়ে বেড়া ও টিনের চালা দিয়ে ঘর তৈরি করতে হয়। আলো বাতাস চলাচলের জন্য ঘরে ছোট জানালা থাকবে।

- ঘরের চাল খড়, টিন অথবা বাঁশের তরজা ও পলিথিন দিয়ে করা যায়।

– ঘরের মেঝেতে তুষ বিছিয়ে দিলে ঘর গরম থাকবে ও মেঝের উপরে অতিরিক্ত ভেজা ভাব দূর হবে।

- ৮ ফুট চরড়া ও ১২ ফুট লম্বা ঘরে ৪ ফুটী ৬ ফুট বাক্স ও ৪ ২ ইঞ্চি লম্বাী ২৪ ইঞ্চি চওড়া বিছানা রাখা যাবে।

ডিম বসানো নিয়ম ও গরম করার পদ্ধতিঃ

-লাইলনের তৈরি রংগিন মশারীর কাপড় দিয়ে ১০০-১২৫ টি ডিমের এক একটি পোটলা তৈরি করতে হবে । মুরগির ডিম বেশি ভংগুর এজন্যে ৪০-৫০ টি ডিম দিয়ে ছোট পোটলা করা ভাল।

- পোটলার মধ্যে ডিম গুলো ঢিলা করে বাঁধতে হবে।

-ডিমের পোটলাগুলোর রোদে ৩/4 ঘন্টা গরম করতে হবে।

ডিমের পুটলি বাঁধার নিয়ম

–ডোলের আকারে গোল ২/৩ ইঞ্চি মোটা তুষ দিয়ে চটের পোঠলা তৈরি করতে হবে।

–প্রতিডোলে ৪০০-৫০০ ডিম বসানো যায় ।

-পোটলাগুলো রোদে ১০৭৮ ডিগ্রী -১৮০ ডিগ্রী ফা: গরম করতে হবে।

- শীতের দিনে সকালে ওও বিকালে ২ বার এবং গরমের দিনে ১ বার তুষের পোটলা গরম করতে হয়।

- রোদ না থাকলে চলির উপরে লোহার কড়াই বসিয়ে তার মধ্যে তুষের পোটলা গরম করতে হয়।

-হিটার বা কেরসিনের চুলার উপরে বাঁশের ডোল দিয়েও উপরিভাগে বাঁশের চালনির উপর ডিম ও পোটলা গরম করা যায়।

- একই ডোলে বিভিন্ন সপ্তাহে বসানো ডিমের পোটলা থাকলে ডিমের ভেতরের তাপে পরে বসানো ডিম গরম হয়।)

ডোলে ডিম বসানো পদ্ধতিঃ

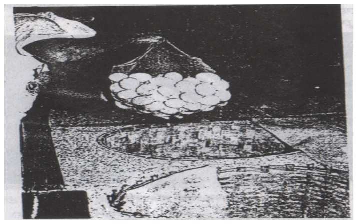

ডোলে ডিম বসানো পদ্ধতি

–ডোলের ভেতর প্রথমে গরম তুষের পোটলা তার উপড় ডিমের পোটলা তারপর পুনরায় তুতষের পোটলা এমনিভাবে ডিমের পোটলা ও তুষের পোটলা বসাতে হবে।

-প্রতিদিন পোটলা বেরকওে ২ বা ৩ বার ডিমের পার্শ্ব পরিবর্তন করতে হবে।

-ডিমের তাপ পরীক্ষার জন্য চোখের উপরে ধরলে তাপ অনুভব করা যাবে।

৭ দিন ১৪ দিন এবং ১৮ দিনে ডিমের মধ্যে ভ্রুণের অবস্থা আলোর সাহায্যে পরীক্ষা করতে হবে। অনুর্বর ডিম ও মৃত ভ্রুণযুক্ত ডিম বাছাই করে ফেলতে হবে।

বাচ্চা ফুটানোর বিছানায় ডিম বসানোর সময় ঃ

– ১৮ দিনে ডোলের মধ্য থেকে ডিম বের করে ডিম ফুটানোর বিছানায় ডিম বসাতে হবে।

– ঘরের তাপমাত্রা থাকবে ৮৫ডিগ্রী ফাঃ এবং হ্যাচারে বা বিছানায় ৯০-৯৫ ডিগ্রী ফাঃ । ঘরে ১০০ ওয়ার্টের ৩-৪ টা বাতি জ্বালানো হলে এই তাপ তৈরি হবে।

– তাপ ৯৫ ডিগ্রী ফাঃ এর বেশি হলে জানালা দরজা খুলে পাখার বাতাস দিতে হবে।

-আর্দ্রতা কমে গেলে সামান্য গরম পানি ডিমের উপর স্প্রে করতে হবে।

-২১ দিনে মুরগির ডিম এবং ২৮ দিনে হাঁসের ডিম ফুটে বিছানার মধ্যে বাচ্চা বের হবে।

-বাচ্চা ফুটার ৩ দিন পূর্বে বিছানার উপরে রাখা ডিম আর ঘুরানো যাবে না।

১০.৩ প্রথমদিন থেকে হ্যাচিংয়ের শেষ দিন পর্যন্ত দৈনন্দিন কার্যাদি ঃ

দৈনন্দিন কার্যক্রম মধ্যে ডিম গুলি প্রতিদিন ৪-৫ ঘন্টা পর পর নাড়াচাড়া করা।ডিমের তাপমাত্রা যেন ১০০ডিগ্রী ফাঃ বজায় থাকে। সে লক্ষ্যে চুলায় গরম করা তুষ, বা ছাই দ্বারা ডিম গুলিকে গরম করতে হবে। উপরের পুটলি নীচে এবং নিচের পুটলি উপরে পালটে দিতে। আর্দ্রতা কম থাকলে অর্থাৎ ৭০% এর নিচে হলে দিনে যতবার ডিম ওলটপালট করা হবে ততবার কুসুম গরম পানিতে নরম কাপড় ভিজিয়ে ডিম মুছে দিতে হবে। এভাবে হ্যাচিং বিছানায় নেওয়া পর্যন্ত করতে হবে। হ্যাচিং বিছানায় নেওয়ার পর ডিম নাড়া চাড়া সম্পুর্ণ নিষিদ্ধ। হ্যাচিং বিছানায় তাপমাত্রা ৯৯ ডিগ্রী ফাঃ এবং আর্দ্রতা
৯০ % রাখতে হবে। আর্দ্রতা ঠিক রাখার জন্য ডিমের উপর কুসুম গরম পানি প্রয়োজন বোধে স্প্রে করে দিতে হবে।

মডিউল -১১
হাঁসের বাচ্চা পালন

১১.১ ব্রডিং ও ব্রডিং কর্মসূচী ঃ

অল্প বয়সে পালক না হওয়ায় বা ছোট থাকায় শরীর অবৃত্ত হয়না এ জন্য শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রনের জন্য কৃত্রিম তাপের প্রয়োজন হয়। এ অবস্থায় কৃত্রিম ভাবে তাপ দেওয়াকে ব্রুডিং বলা হয় । ব্রুডিং দুই ভাবে করা যায় । যথাঃ ক) প্রাকৃতিক ব্রুডিং ও খ) কৃত্রিম ব্রুডিং

ক) প্রাকৃতিক ব্রুডিং ঃ মুরগির সাহায্যে প্রাকৃতিক ব্রুডিং করা হয়।

খ) কৃত্রিম ব্রুডিং ঃ বৈদ্যুতিক, গ্যাস, কেরসিন ও অন্যান্য তাপের উৎসের মাধ্যমে ব্রুডিং করাকে কৃত্রিম ব্রুডিং বলে।

বাচ্চা ব্রুডিং ঘর ঃ

খামারের বাচ্চা পালন করার জন্য তিন প্রকার ঘরের ব্যবহার করা হয় ।যেমনঃ
ক) ব্রুডার হাউজ খ) ব্রুডার-কাম -গ্রোয়ার হাউজ গ) ব্রুডার -কাম- লেয়ার হাউজ।

ব্রুডারে হাউজ ঃ

* স্বতন্ত্র ব্রুডার ঘরের আকার ছোট হওয়াতে তাপ উৎপাদন খরচ কম।
* এই ঘরে বাচ্চা ব্রুডিং শেষে বাচ্চাগুলোকে বিক্রি বা গ্রোয়ার হাউজে স্থানান্তর করা হয়।
* এই সময়ে বাচ্চা স্থানান্তর করলে বাচ্চার ধকল হয় ও রোগ বিস্তারের সম্ভবনা বারে।

ব্রুডরা ঘর কাম- গ্রোয়ার হাউজিঃ

- বর্তমানে এই ঘরের প্রচলন বেশী । ঘরের মধ্যে কিছু পরিমান স্থান পৃথক ভাবে ব্রুডিংয়ের ব্যবস্থা করা যায় এমন ভাবে তৈরীকরা হয়। পরে গ্রোয়িং অবস্থায়ও সেখানেই রাখা হয়।
- বাচ্চা বড় হওয়ার সাথে সাথে স্থানের প্রয়োজন বেশি হতে থাকলে পর্দা সরিয়ে বাচ্চা থাকার স্থান প্রসস্ত করা হয়।
- লেয়ার ঘরে স্থানান্তরের পুর্ব পর্যন্ত এ ঘরে বাড়ন্ত বাচ্চা পালন করা হয়।

ব্রুডার -কাম- লেয়ার হাউজ ঃ

- এই ঘরে বাচ্চা পালন ও বাড়ন্ত বাচ্চা পালন শেষে ডিম পাড়া পর্যন্ত হাঁস পালন করা হয়।

প্রতি ব্যাচ বাচ্চা পালন করার জন্য বাচ্চার সংখ্যা নির্ধারনঃ

- খামারের প্রয়োজন ও ঘরের ধারন ক্ষমতানুসারে প্রতি ব্যাচে বাচ্চা পালন করার জন্য বাচ্চার সংখ্যা নির্ধারন করতে হয়।
-
- ৪ফুট ব্যাসের হোভারের নীচে বাচচা ৪০০ টি ব্রুডিং করা হয়। এই হিসেবে ঘরে ব্রুডারের সংখ্যা নির্ধারন করা হয়।
- ঘরের আয়তন ও বাচ্চার সংখ্যানুসারে ঘরে ব্রুডার স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়।
- সকল সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত শতকরা ৫টি বাচ্চা বেশী পালন করা হয়।

১১.২ ব্রুডিং পুর্ব প্রস্তুতি, বাচ্চা ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা

ব্রুডার ঘর প্রস্তুত

- ব্রুডার ঘর /ব্রুডার -কাম গ্রোয়ার ঘর খালি হওয়ার সাথে সাথে ঘরের সমস্ত সরঞ্জাম , লিটার /ব্রুডিং খাঁচা ইত্যাদি বের করতে হয়।
- ঘরের কোন সংস্কার প্রয়োজন হলে ব্যবস্থা নিতে হয়।
- ঘরের মেঝেতে লেগে থাকা ময়লা পানি দিয়ে ভিজিয়ে তুলে ফেলতে হয়।
- পরিস্কার পানি দ্বারা সমস্ত ঘর ধুয়ে ফেলতে হয়।
- ভেন্টিলেশন ,ফ্যান,লাইট ,দরজা জানালা ঝেড়ে মুছে পরিস্কার করতে হয়।

ঘর জীবানু মুক্ত করনঃ

- জীবানুণাশক ব্যবহৃত পানিতে ব্রাশ ভিজিয়ে ভেন্টিলেশন ,ফ্যান,লাইট ,দরজা জানালা ঝেড়ে মুছে পরিস্কার করতে হয়।
- ঘরের মেঝেতে আইয়োসান / ফিনাইল/স্যাভলন/ডেটল ইত্যাদি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হয়।
- অথবা অল্প খরচের জন্য ভিজা ঘরে মেঝের উপর প্রতি ১০০বর্গ ফুট স্থানে এক কেজি কাপড় কাচা সোডা ভালভাবে ছড়িয়ে ১৫ মিনিট পরে ভালভাবে ধুয়ে ফেলতে হয়।
- ঘর পরিস্কার করার সময় ও জীবানুনাশক ব্যবহারের সময় পায়ে গাম্বুট,দেহে এফরোন ও মুখে মুখোশ ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় ।

ঘরে লিটার / খাঁচা ও সরঞ্জামাদি স্থাপন

- ঘর জীবানুমুক্ত হওয়ার পর ভালভাবে শুকাতে হবে (১০-১৫ দিন) ।
- শুকনা মেঝের উপর ২” পুরোকরে লিটার সামগ্রী বিছানোর পর ব্রুডার গার্ড, হোভার, হিটার ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে স্থাপন করতে হয়।
- ব্রুডার গার্ডের একফুট ভিতরে ড্রিংকার ও খাদ্যের পাত্র স্থাপনের জন্য স্থান রাখতে হয়।
- খাঁচায় ব্রুডিং করলে লিটারের পরিবর্তে ব্রুডার খাঁচা স্থাপন করা হয়।
- ব্রুডার -কাম-গ্রোয়ার হাউজের উন্মুক্ত স্থান পর্দা দ্বারা ঢেকে দিতে হয়। গরমকালে চটের পর্দা এবং শীত ও বর্ষার সময় প্লাষ্টিক পর্দা ব্যবহার করা হয়।
- ব্রুডারক -কাম গ্রোয়ার হাউজে বাচ্চা ব্রুডিংয়ের জন্য নিদিষ্ট স্থান পাষ্টিক পর্দা দ্বারা ঘিরে পৃথক করতে হয় এবং ঘেরা স্থানে ব্রুডার স্থাপন করতে হয়।

ব্রুডার ও ঘরের তাপ মাত্রাঃ

ঘরের তাপ মাত্রা ঃ

ঘরে বাচ্চা প্রদানের সময় ঘরের তাপ মাত্রা ৭৫ ডিগ্রী ফাঃ থাকে এবং ব্রুডিং শেষে ৬৫-৭৫ ডিগ্রী ফাঃ তাপমাত্রা রাখা হয়।

ব্রুডারের তাপ মাত্রা ঃ

বাচ্চার বয়স	বাচ্চা			
সপ্তাহ	শীতকাল		গ্রীষ্মকাল	
	ফাঃ	সেঃ	ফাঃ	সেঃ
১-২	৯৫.০	৩৫.০	৯১.০	৩২.৭
২-৩	৯০.০	৩২.২	৮৬.০	৩০.০
৩-৪	৮৫.০	২৯.৪	৮১.০	২৭.২
৪-৫	৮০.০	২৬.৬	৭৫.০	২৩.৮

বাচ্চা ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা

ব্রুডার চালূ ও পাত্রের পানি প্রদান

- বাচ্চা গ্রহণের দিন ব্রুডারে পানির পাত্রে পানি দেওয়ার পর এবং বাচ্চা গ্রহণের ৩ ঘন্টা পূর্বে ব্রডার চালু (তাপ উৎপাদন) করতে হয়। বেশী আগে চালু করলে লিটার বেশী শুকিয়ে যায় এবং পরে চালূ করলে পানির তাপমাত্রা যথেষ্ট পরিমান হয় না্‌ পানির তাপমাত্রা ৬৫ ফাঃ (১৮সেঃ) হওয়া বাঞ্ছনীয় । (পানি প্রদান পদ্ধতি দ্রষ্টব্য)
- এই সময় প্রশস্ত খাদ্য পাত্র হিসাবে কাগজ /চিক বাক্সের ঢাকনি/পাষ্টিক ট্রে হোভারে নীচে স্থাপন করা হয়।

ব্রুডারে বাচ্চা প্রদান ঃ

- খামারে বাচ্চা পৌছানোর সাথে সাথে পূর্ব থেকে প্রস্তুত পরিচার্যকারী বাচ্চার সরবরাহ গ্রহণ করবে এবং দ্রুত ব্রুডারে প্রদান করবে।
- সাধারনত সকালের দিকে ব্রুডারে বাচ্চা প্রদান করলে পরিচর্যা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় এবং সকালে আবহাওয়া ঠান্ডা থাকার দরুন কম ধকল সৃষ্টি হয়।
- বাচ্চা গ্রহণের সময় চিক বাক্সের ভিতর মৃত বাচ্চা থাকলে তার সংখ্যা হিসাব করতে হয়্‌
- সম্ভব হলে বাচ্চার প্রাথমিক নমুনা ওজন রাখা যায়।
- বাচ্চা সরবরাহ তালিকার সাথে কোন অমিল থাকলে হিসাবে আনতে হয় এবং বাচ্চা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করতে হয়।

বাচ্চার আচরণ পরীক্ষাঃ

- ব্রুডারে বাচ্চা প্রদানের পর বাচ্চার আচরণ পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ্‌
- বাচ্চার জন্য অনুকূল তাপমাত্রা বাচ্চার আচরণ দেখে অনুমান করতে হয়, যেমন-

- ব্রুডারে তাপ বেশি হলে বাচ্চা তাপের উৎস হতে দূরে যায় এবং ব্রুডার গার্ডের গা ঘেষে জমা হয় ।

-ব্রুডারে তাপ কম হলে তাপের উৎসের নীচে বেশী তাপের আশায় বাচ্চা ভীড় করে এবং পরস্পর জড়াজড়ি করে গরম হতে চেষ্টা করে। এই অবস্থায় চাপাচপিতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে বাচ্চা মারা যায়।

-তাপ বাচ্চার অনুকূলে থাকলে বাচ্চা স্বতঃ স্ফুর্ত থাকে এবং সুষ্ঠুভাবে খাদ্য খায় ও পানি পান করে।

-বাচ্চা স্বতঃস্ফুর্তভাবে চলাচল ও পানি পান না করলে বুঝতে হয় পরিবহন জনিত ধকলে পীড়িত অথবা অসুস্থ।

* হোভার অথবা তাপের উৎস উঁচু-নীচু কওে তাপ কম -বেশী করা হয়।

* ব্রুডারে বাচ্চা দেওয়ার পর রুটিন মত পর্যবেক্ষণ যথেষ্ট নয়। বার বার ব্রুডার ঘরে প্রবেশ করে আচরণ পরীক্ষার পর ব্যবস্থা নিতে হয়। ২ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত বাচ্চার অত্যন্ত সংকটময় সময় ।

* হঠাৎ করে আলো নিভে যাওয়া ,ঘরের তাপমাত্রা পরিবর্তন, ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা, খাদ্য ও পানির পরিবর্তন, বিভিন্ন প্রকার শব্দ ও হট্টগোল বাচ্চার ধকল সৃষ্টি করে। বাচ্চার আচরণ দেখে এ সমস্ত ধকল প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

* ব্রুডারে বাচ্চা দেওয়ার পর তারা পানি পান করে।

ব্রুডারে বাচ্চার পানি পান করার প্রবণতা পরীক্ষা করা হয়। প্রত্যেক বাচ্চা যাতে সহজে পানি পান করতে পারে সে ব্যবস্থা নিতে হয়। প্রয়োজন হলে হাতে ধরে পানি পান করাতে হয়।

খাদ্য প্রদান

- ব্রুডারে বাচ্চা দেওয়ার ২-৩ ঘন্টা পর প্রত্যেক বাচ্চার সঠিক পানি পান নিশ্চিত হয়ে প্রাথমিক পাত্রে ষ্টার্টার রেশন প্রদানের পূর্বে গম , ভুট্টা চূর্ন অথবা চাউলের খুঁদ দেওয়া যায়।

পানিতে বাচ্চা ছাড়বার সময়ঃ

সাধারণতঃ চার সপ্তাহ পর্যন্ত হাঁসের বাচ্চা পানিতে ছাড়া উচিৎ নয়। ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত ঘরে প্রতিপালন করে তারপর পানিতে ছাড়বার অভ্যাস করতে হবে। পানিতে ছাড়বার সময় হলে ১ ম দিনেই সারা দিন পানিতে রাখা ঠিক নয় , ধীরে ধীরে পানিতে চরার অভ্যাস করতে হবে। গরমকালে দুসপ্তাহ পরেই পানিতে ছাড়া যেতে পারে।

১১.৩

১০০ থেকে ৫০০টি বাচ্চা পালনের আয়ব্যয়ের হিসাব ঃ

১০০ টি বাচ্চার ক্রয় মূল্য	=১০০০.০০ টাকা
১০০ টি বাচ্চার ৮ সপ্তাহ পয়ন্ত খাদ্য খরচ (২৫২ কেজি x ২০.০০)	= ৫০৪০.০০
প্রতি পালন ও অন্যান্য খরচ (খাদ্য খরচের ১/৪ অংশ)	= ১২৬০.০০
সর্বমোট	= ৭৩০০.০০
১০% মৃত্যু হার ধরে ৯০টি	
৮ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চার বিক্রয় মূল্য গড়ে (১২০.০০ x ৯০)	= ১০,৮০০.০০
লাভ = (১০,৮০০- ৭৩০০)	= ৩৫০০.০০

এভাবে ৫০০টি বাচ্চার লাভ ৫ গুন হবে।

১১.৪ ১০০টি বাড়ন্ত বাচ্চা পালনের আয় ব্যয়ের হিসাঃ

১০০টি বরড়ন্ত বাচ্চার ৮ সপ্তাহের বাচ্চার খরচ	= ৭৫০০.০০
৯ থেকে ১৮ সপ্তাহ পর্যন্ত খাদ্য খরচ	
(৪ কেজি × ১০০ ×১৭.০০)	= ৬৮০০.০০
অন্যান্য খরচ	= ১০০০.০০
মোট খরচ	= ১৫৩০০.০০
বিক্রয় মূল্য (২% মৃত্যু হার ধরে)	= ১৭৬০০.০০
লাভ	= ২৩৪০.০০

১১.৫ ১০০টি ডিম পাড়া মুরগির আয় ব্যয়ের হিসাবঃ

১০০টি মুরগি কেনার খরচ	= ১৮,০০০.০০
১৮ সপ্তাহ থেকে ডিম পাড়া শেষ পর্যন্ত খাদ্য খরচ	
(৪৭ কেজি×১০০×১৮.০০)	= ৮৪,৬০০.০০
অন্যান্য খরচ	= ১০,০০০.০০
মোট খরচ	= ১,১২,৬০০.০০
বিক্রয় মূল্য (২% মৃত্যু হার ধরে)	
ডিম (৩০০ x ৯৮ x ৪.৫০)	= ১,৩২,৩০০.০০
মুরগি বিক্রয়	= ৯,৮০০.০০
মোট বিক্রয়	= ১,৪২,১০০.০০
লাভ (১,৪২,১০০-১,১২,৬০০)	= ২৯,৫০০.০০

মডিউল -১২
লাভজনক ভাবে দেশী মুরগি পালন কৌশল

১২.১ দেশী মুরগি পালন কৌশলের বর্ণনা ঃ

আয় বৃদ্ধি ও পারিবারিক পুষ্টির নিশ্চয়তা বিধানে দেশী মুরগি প্রতিপালন বিশেষ অবদান রাখতে পারে । আমরা সবাই বলে থাকি দেশী মুরগির উৎপাদন কম । কিন্তু বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষ লক্ষ্য এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করে দেশী মুরগীর উৎপাদন দ্বিগুনের ও বেশী পাওয়া সম্ভব। দেশী মুরগি থেকে লাভ জনক উৎপাদন পওয়ায় বিভিন্ন কৌশল এখানে বর্ননা করা হয়েছে।

গবেষনায় দেখা গেছে দেশী মুরগির ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি করে বাজারে বিক্রিয় করার চেয়ে ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা তৈরী করে ৮-১২ সপ্তাহ বয়সে বিক্রি করলে লাভ বেশী হয়। এক সংগে ১০-১২ টি মুরগি নিয়ে পালন শূরু করতে হবে। তবে কখনও ১৫-১৬ টির বেশী নেওয়া ঠিক না । তাতে অনেক অসুবিধাই হয় । শুরুতে মুরগি গুলোকে ক্রিমি নাষক ঔষধ খাওয়ানোর পরে রানীক্ষেত রোগের টীকা দিতে হবে। মুরগির গায়ে উকুন থাকলে তাও মেরে নিতে হবে। প্রতিটি মুরগিকে দিনে ৫০-৬০ গ্রাম হারে সুষম খাদ্য দিতে হবে। আজকাল বাজারে লেয়ার মুরগির সুষম খাদ্য পাওয়া যায় । তা ছাড়া আধা আবদ্ধ এ পদ্ধতিতে পালন করলে লাভ বেশী হয়। মুরগির সাথে অবশ্যই একটি বড় আকারের মোরগ থাকতে হবে। তা না হলে ডিম ফুটানো যাবে না । ডিম পাড়া শেষ হলে মুরগি উমে আসবে । তখন ডিম দিয়ে বাচ্চা ফুটানোর ব্যবস্থা নিতে হয়। এক সঙ্গে একটি মুরগির নীচে ১২-১৪ টি ডিম বসানো যাবে ।

খামারের আদলে বাঁশ, কাঠ খড়, বিচলী তাল নারকেল সুপারি পাতা দিয়ে যত কম খরচে স্থানান্তর যোগ্য ঘর তৈরী করা সম্ভব তা করা যায়। ঘর তৈরীর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সঠিক মাপের হয় এবং পর্যাপ্ত আলো বাতাস চলাচল করতে পারে । বানানোর পর ঘরটিকে বাড়ীর সবচেয়ে নিরিবিলি স্থানে রাখতে হবে । মাটির উপর ইট দিয়ে তার উপর বসাতে হবে। তাহলে ঘর বেশী দিন টিকবে । ফুটানোর ডিম সংগ্রহ ও সংরক্ষন আরেকটি প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ন কাজ। ডিম পাড়ার পর ডিম সংগ্রহের সময় পেন্সিল দিয়ে ডিমের গায়ে তারিখ লিখে ঠান্ডা জায়গায় সংরক্ষন করতে হবে। ডিম পাড়া শেষ হলেই মুরগি কুঁচো হবে। গরম কালে ৫-৬ দিন বয়সের ডিম এবং শীত কালে ১০-১২ দিন বয়সের ডিম ফুটানোর জন্য নির্বচন করতে হবে।

১২.২ দেশী মুরগি পালন কৌশলের বিশেষ নজর দেয়ার ধাপ সমূহ ঃ

উমে বসানো মুরগির পরিচর্যা করতে হবে। মুরগির সামনে পাত্রে সবসময় খাবার ও পানি দিয়ে রাখতে হবে যাতে সে ইচ্ছে করলেই খেতে পারে । তাহলে মুরগির ওজন হ্রাস পাবেনা এতে বাচ্চা তোলার পর আবার তাড়াতাড়ি ডিম পাড়া আরম্ভ করবে।

* ডিম বসানোর ৭-৮ দিন পর আলোতে রাতের বেলা ডিম পরীক্ষা করলে বাচ্চা হয় নাই এমন ডিম গুলো চেনা যাবে এবং বের করে অনতে হবে। বাচ্চা হওয়া ডিমগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে দিতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন মুরগি বিরক্ত না হয়।

* প্রতিটি ডিমের গায়ে সমভাভে তাপ লাগার জন্য দিনে কম পক্ষে ৫-৬ বার ওলট পালট করে দিতে হবে।

* বাতাসের আর্দ্রতা কম হলে বিশেষ করে খুব গরম ও শীতের সময় ডিম উমে বসানোর ১৮- ২০দিন পর্যন্ত কুসুম গরম পানিতে হাতের আঙ্গুল ভিজিয়ে পানি স্প্রে করে দিতে হবে।

* ফোটার পর ৫-৬ ঘন্টা পর্যন্ত মাকে দিয়ে বাচ্চাকে উম দিতে হবে। তাতে বাচ্চা শুকিয়ে ঝরঝরে হবে।

১২.৩ বাচ্চা ফুটার পর বাচ্চার পরিচর্যা ও ডিম পাড়া মুরগির পরিচর্যা ঃ

গরম কালে বাচ্চার বয়স ৩-৪ দিন এবং শীত কালে ১০-১২ দিন পর্যন্ত বাচ্চার সাথে মাকে থাকতে দিতে হবে। তখন মুরগি নিজেই বাচ্চাকে উম দিবে। এতে কৃত্রিম উমের (ব্রুডিং) প্রয়োজন হবে না। এ সময় মা মুরগিকে খাবার দিতে হবে। মা মুরগির খাবারের সাথে বাচ্চার খাবার ও কিছূ আলাদাকরে দিতে হবে। বাচ্চা গুলো মায়ের সাথে খাবার খাওয়া শিক্ষবে। উপরোক্ত বর্নিত সময়ের পর মুরগিকে বাচ্চা থেকে আলাদা করতে হবে। এ অবস্থায় বাচ্চাকে কৃত্রিম ভাবে ব্রুডিং ও খাবার দিতে হবে। তখন থেকেই বাচ্চা পালনের মত বাচ্চা পালন পদ্ধতির সব কিছুই পালন করতে হবে। মা মুরগিকে আলাদা করে লেয়ার খাদ্য দিতে হবে। এ সময় মা মুরগিকে তাড়াতাড়ি সুস্থ হওয়ার জন্য পানিতে দ্রবনীয় ভিটামিন দিতে হবে। মা মুরগি ও বাচ্চা এমনভাবে আলাদা করতে হবে যেন তারা দৃষ্টির বাহিরে থাকে। এমন কি বাচ্চার চিচি শব্দ যেন মা মুরগি শুনতে না পায় । তা না হলে মা ও বাচ্চার ডাকা ডাকিতে কেউ কোন খাবার বা পানি কিছুই খাবে না । আলাদা করার পর অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে গেলে আর কোন সমস্যা থাকে না । প্রতিটি মুরগিকে এ সময় ৮০-৯০ গ্রাম লেয়ার খাবার দিতে হবে। সাথে সাথে ৫-৭ ঘন্টা চড়ে বেড়াতে দিতে হবে। প্রতি ৩-৪ মাস পর পর কৃমির ঔষধ এবং ৪-৫ মাস পর পর আর. ডি. ভি . টীকা দিতে হবে। দেশে একটি মুরগি ডিম পাড়ার জর্ন্য ২০ -২৪দিন সময় নেয় । ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানোর জন্য ২১ দিন সময় নেয় । বাচ্চা লালন পালন করে বড় করে তোলার জন্য ৯০-১১০ দিন সময় নেয় । ডিম থেকে এ ভাবে (৯০-১১০ দিন) বাচ্চা বড় করা পর্যন্ত একটি দেশী মুরগির উৎপাদন চক্র শেষ করতে স্বাভাবিক অবস্থায় ১২০- ১৩০ দিন সময় লাগে। কিন্তু মাকে বাচ্চা থেকে আলাদা করার ফলে এই উৎপাদন চক্র ৬০ -৬২ দিনের মধ্যে সমাপ্ত হয়। বাকি সময় মুরগিকে ডিম পাড়ার কাজে ব্যবহার করা যায় । এই পালন পদ্ধতিকে ক্রিপ ফিডিং বলে ।

* ক্রিপ ফিডিং পদ্ধতিতে বাচ্চা পালন করলে মুরগিকে বাচ্চা পালনে বেশী সময় ব্যয় করতে হয় না । ফলে ডিম পাড়ার জন্য মুরগি বেশী সময় দিতে পারে । এই পদ্ধতিতে বাচ্চা ফুটার সংখ্যা বেশী হয় । দেখা গেছে বাচচার মৃত্যুহারও অনেক কম থাকে। মোট কথা অনেক দিক দিয়েই লাভবান হওয়া যায় । এই পদ্ধতি বর্তমানে অনেকে ব্যবহার করে লাভবান হচ্ছেন।

মডিউল -১৩
কোয়েল পালন

১৩.১ কোয়েল পালনের গুরুত্ব ও জাত পরিচিতি ঃ

আমাদের দেশে পোষা পাখির মধ্যে কোয়েল একটি নতুন সংযোজন। বাংলাদেশের আবহাওয়া কোয়েল পালনের জন্য খুবই উপযোগি। কোয়েলের মাংস এবং ডিম সুস্বাদু ও পুষ্টিকর । পুষ্টির ঘাটতি মেটাতে কোয়েল পালন অনেক মূল্যবান ভূমিকা রাখতে পারে। হাঁস-মুরগির মত কোয়েল পালন করে অনেকেই লাভবান হয়েছেন। অনেকে আত্মকর্ম সংস্থানের জন্য কোয়েল পালন পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন । বর্তমানে ঢাকা সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কোয়েল পালন খামার গড়ে উঠেছে। ইতিমধ্যেই কোয়েল পালন যথেষ্ট্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং পোল্ট্রি শিল্পের একটি মজবুত অংগ হিসেবে নিজের স্থান করে নিয়েছে।

বাণিজ্যিক জাপানী কোয়েলের অনেক গুলি জাত ও উপজাত রয়েছে। জাত ও উপজাত ভেদে কোয়েলের গায়ের রং ওজন, আকার, আকৃতি, ডিমপাড়ার হার, ডিমের ওজন ইত্যাদির অনেক পার্থক্য রয়েছে।

বর্তমানে পৃথিবীতে উদ্দেশ্য ও অবস্থান অনুযায়ী তিন ধরনের কোয়েল রয়েছে।

(১) বন্য কোয়েল (Wild Quail)
(২) বানিজ্যিক কোয়েল (Commercial Quail)
(৩) ল্যাবরেটরী কোয়েল (Laboratory Quail)

ল্যাবরেটরী কোয়েল বিভিন্ন গবেষনার কাজে ব্যবহার করা হয় কিন্তু খামারীদের কাছে বাণিজ্যিক কোয়েল গুরুত্বপূর্ন । উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাণিজ্যিক কোয়েল তিন প্রকার যথাঃ

(১) লেয়ার কোয়েল (Layer Quail)
(২) ব্রয়লার কোয়েল(Broiler Quail)
(৩) ব্রিডার কোয়েল (Breeder Quail)

১। লেয়ার কোয়েল ঃ

ডিম উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কায়েলকে লেয়ার কোয়েল বলা হয় । লেয়ার কোয়েল শুধু খাবার ডিম উৎপাদনের জন্য পালন করা হয় । লেয়ার কোয়েলের সাথে তাই কোন মাদী কোয়েল রাখা হয়না । সাধারণত ৬-৭ সপ্তাহ বয়স থেকে মাদী কোয়েল ডিম পাড়া শুরু করে এবং প্রতিটি কোয়েল বছরে ২৯০ - ৩০০টি ডিম পেড়ে থাকে। লেয়ার খামারে সাধারনত ৫৪ সপ্তাহব্যাপী মাদী কোয়েল পালন করা হয় । এরপর এগুলোকে ডিম উৎপাদনের জন্য বাতিল করে দেয়া হয় এবং মাংসের জন্য বিক্রয় করা হয়।

বানিজ্যিক কোয়েল

২। ব্রয়লার কোয়েল ঃ

নরম ও সুস্বাদু মাংস উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত জাপানি কোয়েলকে 'ব্রয়লার কোয়েল' বলা হয়। এ উদ্দেশ্যে মর্দা-মাদী নির্বেশেষে জন্মের দিন থেকে পাঁচ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত এদেরকে পালন করা হয়। এ সময়ের মধ্যে

একেকটির জীবিত ওজন ১৪০ -১৫০ গ্রাম হয়ে যায়। এগুলো থেকে প্রায় ৭২.৫% খাওয়ার উপযোগী মাংস পাওয়া যায়। মাংস উৎপাদনের জন্য পৃথিবীতে যতো ধরনের কোয়েল তৈরি করা হয়েছে তার মধ্যে ভারতের তামিলনাড়ু প্রদেশের কোইমবাটোরস্থ এ.ভি.এম. হ্যাচারিজ এন্ড ব্রিডিং রিসার্চ সেন্টার (প্রাঃ) লিমিটেড কর্তৃক উৎপন্ন সাদা কোয়েলই উৎকৃষ্টতম । অবশ্য এটি এখনও আমাদের দেশে আনা হয়নি। তাই আপাতত লেয়ার কোয়েলগুলোই ব্রয়লার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এদের মাংস উৎপদন হারও যথেষ্ট ভাল।

৩। ব্রিডার কোয়েলঃ

লেয়ার ও ব্রয়লার কোয়েলের বাচ্চা ফোটানোর লক্ষ্যে ডিম উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত বাছাই করা প্রজননে সক্ষম মর্দা-মাদী কোয়েলগুলোকে ব্রিডার কোয়েল বলা হয়। সাধারণত ৭-৮ সপ্তাহ বয়সের মাদী এবং ১০সপ্তাহ বয়সের মর্দা কোয়েরকে ব্রিডিং খামারে এনে পালন করা হয়। তবে এদের বয়স ১০ সপ্তাহ হওয়ার পর প্রজননের কাজে ব্যবহার করা উত্তম।এখানে এদেরকে ৩০ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত রাখা হয়। ডিমের উর্বরতা ভাল রাখার জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে ২টি মাদী কোয়েলের সংগে একটি মর্দা কোয়েল রাখতে হয়।

১৩.২ কোয়েল পালন পদ্ধতি (কোয়েলের বাচ্চা পালন ও বয়স্ক কোয়েল পালন)ঃ

মুরগির বাচ্চার মত কোয়েলের বাচ্চাকেও কৃত্রিম পদ্ধতিতে ব্রুডিং করা দরকার হয়। কোয়েল পালনের পুরু সময়কালকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়। (১) বাচ্চা পালন পর্ব (২) বয়স্ক কোয়েল পর্ব

বাচ্চা পালন পর্ব ঃ শুন্য থেকে ৩৫ দিন পর্যন্ত বাচ্চা পালন পর্বের অর্ন্তরভুক্ত তবে ১৪ দিন পর্যন্ত ব্রুডিং করতে হয়। পরিবেশের তাপমাত্রার কারনে ব্রুডিং পর্ব ৩ সপ্তাহ বা তারও বেশী সময় হতে পারে। একদিন বয়সের বাচ্চার জন্মের পর থেকে কৃত্রিম ভাবে তাপের মাধ্যমে পালন করাকে ব্রুডিং বলা হয়।

কোয়েলের বাচ্চা পালন

কোয়েলের বাচ্চা ব্যাটারি বা লিটার যে কোন প্রাণিতিতেই পালন করা যায়। তবে যে পদ্ধতিতেই পালন করা হোক না কেন এদের খাঁচা যে ঘরে রাখা হবে বা লিটার পদ্ধতিতে যে ঘরে পালন করা হবে সেটি যথেষ্ট মজবুত হওয়া বাঞ্ছনীয় । ঘরটি এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যেন তাতে পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে ; বৃষ্টি বাদলে যেন পানি প্রবেশ না করে ; ইদুঁর বা অন্যান্য প্রাণি-পাখি যেন উৎপাত না করে । তাছাড়া ঘরটি বয়স্ক কোয়েল বা হাঁস-মুরগির ঘর থেকে কিছুটা দূরে হওয়া বাঞ্ছনীয় । ঘরটিকে সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। । কোয়েলের বাচ্চার ব্রুডিং ও রিয়ারিং এর জন্য আলাদা ঘর ব্যবহার করা উচিত তবে তা সম্ভব না হলে একই ঘরে বেড়া বা পার্টিশন দিয়ে পালন করা যেতে পারে। তবে কখনোই একই খাঁচায় বা একসঙ্গে লিটারের বিভিন্ন বয়সের কোয়েল পালন করা উচিত নয়।

সঠিক ভাবে কোয়েলের বাচ্চা পালনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মেনে চলতে হবে।

লিটারে কোয়েল পালন

১. সঠিক তাপমাত্রা
২. পর্যাপ্ত আলো
৩. বায়ু চলাচল ব্যবস্থা
৪. বাচ্চার ঘন্তব
৫. খাদ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা

৬. স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ।

১. সঠিক তাপমাত্রা ঃ বাচ্চাদের জীবন ধারণ ও সঠিক বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে তাপমাত্রা গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা রয়েছে। পরিবেশের তাপমাত্রার সঙ্গে মিল রেখে শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা জন্মের প্রথম দিকে এদের খুবই কম থাকে। তাছাড়া এদের দেহের কোমল পালকের আচ্ছাদনও পর্যাপ্ত তাপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ফলে তাপের অভাবে শরীর ঠান্ডা হয়ে যায়। এতে অনেক বাচ্চাই মারা যায়। যেগুলো বেঁচে থাকেব তাদের বৃদ্দির সঠিক হয় না। তাই বাচ্চা পালন ঘরে সঠিকভাবে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। বাচ্চা পালন ঘরের তাপমাত্রা ২১ডিগ্রী -২২ সেলসিয়াস এ রাখতে হয়। ব্রডারের বাচ্চাদের তাপ দেয়ওয়ার বিশেষ ধরনের যন্ত্র রাখতে হয়। এরপর প্রতি তিন -চারদিন পরপর ২.৫ -৩.০ সেঃ করে কমিয়ে তিন সপ্তাহ পর তা ঘরের তাপমাত্রায় নামিয়ে আনতে হবে। শীতকাল ছাড়া বাচ্চা পালনের পরবর্তী দুই সপ্তাহ শুধু মাত্র রাতের বেলায় তাপের ব্যবস্থা করলেই চলে।

২. পর্যাপ্ত আলোঃ বাচ্চাদের বৃদ্ধিতে আলো গুরুত্ব পূর্ন ভূমিকা রয়েছে। বাচ্চাদের জনন গ্রন্থির বৃদ্ধিতে আলোর বর্ণ বেশ প্রভাব ফেলে । যেমন মর্দা বাচ্চাদের শুক্রাশয়ের বৃদ্দিতে লাল বর্ণের আলোর ভূমিকা নীল বর্ণের তুলনায় বেশি তাছাড়া আলোর সাহায্যেই এরা নিজেদেরকে ব্রডার হাউজের / কেইজের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে শেখে এবং খাদ্য ও পানি পান করার প্রতি মনোযোগি হয়। দু সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত বাচ্চাদের ঘরে ২৪ ঘন্টা আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। তৃতীয় সপ্তাহের শেষে তা কমিয়ে দৈনিক ১২ ঘন্টায়ই সীমাব্ধ রাখতে হবে। তবে তাড়াতাড়ি যৌন পরিপক্ক আনতে হবে প্রথম দিন থেকে ৫ -৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত দৈনিক ২৪ ঘন্টা আলো জ্বেলে রাখতে হবে। ব্রয়লার ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি ওজন বাড়ানোর জন্য ২৫ -২৮ দনি থেকে ৩৫ দিন পর্যন্ত বাজারজাত করার ৭-১০ দিন পূর্ব থেকে দৈনিক ৮ঘন্টা আলোতে ও ১৬ ঘন্টা অন্ধকারে রাখতে হবে।

৩. বায়ু চলাচল ব্যবস্থা ঃ বাচ্চা পালন ঘে পযাপ্ত বায়ূ চলাচল ব্যবস্থা রাখতে হবে। এর মাধ্যমে গরমের দিনে ঘরের মধ্যে সৃষ্ট তাপ সহজেই বেরিয়ে যেতে পারবে। এছাড়া ঘরে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ বায়ূ ঢোকা ও ঘরে সৃষ্ট ক্ষতিকারক ঘ্যাস বের হয়ে যাওয়ার জন্য সঠিক বায়ূ চলাচল ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। ব্রুডিংয়ের প্রথম সপ্তাহে ঘরে বায়ু চলাচল ব্যবস্থা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখতে হবে এবং ধীরে ধীরে তা বড়াতে হবে। ঘরের আপেক্ষিক আর্দ্রতা প্রথম তিন সপ্তহ ৬০-৬৫% পরবর্তী দু'সপ্তহ ৫৫-৬০% এ রাখতে হবে।

৪. বাচ্চার ঘনত্বঃ ঘরের ভিতরে বা ব্রুডারের নিদিষ্ট জায়গার ভিতরে মোট বাচ্চার ঘনত্বের ওপর এদের সঠিক বৃদ্ধি নির্ভর করে। তিন সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত প্রতিটি বাচচার জন্য ব্রুডারের হোভারের নিচে ৭৫ বর্গ সেঃ মিঃ জায়গা বরাদ্ধ করতে হবে। রান এর ব্রুডারের হোভারে চারদিক থেকে চিক গার্ড পর্যন্ত ফাঁকা জাযগাটুকু একই পরিমান জায়গা থাকবে। ৩-৫ সপ্তাহ পর্যান্ত ১৫০ -১৭৫ বর্গসেঃমিঃ জায়গার প্রয়োজন হবে। লিটার পদ্ধতিতে প্রতিটি বাচ্চার জন্য সর্বমোট ২০০-২৫০ বর্গসেঃমিঃ জায়গা দিতে হবে।

৫. খাদ্য ও পানির ব্যবস্থাপনাঃ বাচ্চাদের জীবনের প্রথম দিকে খাদ্য ও পানির সহজ প্রাপ্যতা আরামপ্রদ পরিবেশ তৈরিতে গুরুত্বর্পূর্ন ভূমিকা পালন করে। যদি কোন বাচ্চা তার ধারে কাছে খাদ্য ও পানি খুঁজে না পায় , তবে তার শরীর পর্যাপ্ত শক্তির অভাবে ঠেন্ডা হয়ে যাবে ও না খেতে পেয়ে ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে মারা যাবে। জন্মের প্রথম সপ্তাহে বাচ্চা মৃত্যুর একটি অন্যতম প্রধান কারণ হলো পানির অভাব। যেহেতু ব্রডিংয়ের উচচ্ তাপমাত্রায় বাচ্চারা সহজেই পানিশূন্যতায় ভোগে তাই এদের জন্য পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ঃ বাচ্চদের সঠিক বৃদ্ধির জন্য ঘর ও ব্রুডারের পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয় । ঘরের ভিতর কোনো ময়লা আর্বজনা থাকা চলবে না। লিটার ভেজা থাকা চলবে না । বাচ্চা

পালন ঘরে পালনকারি ছাড়া অন্যদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করতে হবে। তাছাড়া অন্যান্য প্রাণিপাখিও যেন ঘরের আশেপাশে না আসতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কোনো বাচ্চা নখ,পা,পালক, ঠোঁট প্রভৃতিতে ময়লা জমলে তা আলতোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। ময়লার চোখ বন্ধ হয়ে গেলে একটুকরা তুলো পানিতে ভিজিয়ে ময়লা পরিষ্কার করা উচিত।

বয়স্ক কোয়েল পালন ঃ
লেয়ার খামারে পূর্নবয়স্ক মাদী কোয়েলগুলোকে ষষ্ঠ সপ্তাহ বয়স থেকে ডিম পাড়ার ঘওে লিটার বা খাঁচা পদ্ধতিতে পালন করা হয়। ব্রিডার কোয়েলগূলোকে ব্রিডার কেইজে দেওয়ার পূর্বে মর্দা ও মাদী আলাদাভাবে পালন করতে হবে। সাধারণত ৭-৮ সপ্তাহ বয়সের বাছাই করা মর্দা কোয়েলগুলো ব্রিডার কেইজে একসঙ্গে রাখা হয় এই লক্ষ্যে ৩/৪ সপ্তাহ বয়সে যখন পালকের রং দেখে পার্থক্য করা যাবে তখন থেকে ব্রিডার কেইজে দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এদেরকে আলাদাভাবে পালন করতে হবে। তাছাড়া ব্রিডিং খাঁচায় মর্দা ও মাদী সব সময়ের জন্যই একসঙ্গে রাখা যাবে না। বরং দরকার মতো সময়ে প্রজন করানোর জন্য মর্দাকে ব্রিডিং খাঁচায় ঢুকানো হবে। এবং নিদির্ষ্টকাল পরে আবার পৃথক করে ফেলতে হবে।ব্যাটারি বা লিটর দু' পদ্ধতিতে পালন করা গেলেও কোয়েলের জন্য ব্যাটারি পদ্ধতিই সহজ, রিাপদ ,টেকসই ও স্বাস্থ্য সম্মদ । তাই এ পদ্ধতিতে খামার করাই লাভজনক ।

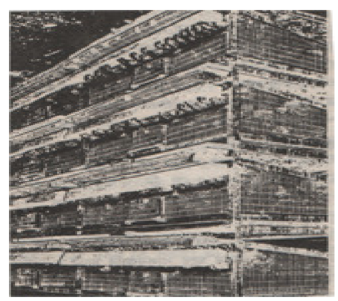

খাঁচায় বয়স্ক কোয়েল পালন

সাফল্যজনকভাবে বয়স্ক কোয়েল পালন করতে হলে খামারিদের নিম্নের বিষয়গুলো সঠিকভাবে মেনে চলতে হবে।

১. তাপমাত্রা ঃ বয়স্ক কোলের ঘরে তাপমাত্রা ২১ডিগ্রী -২২ডিগ্রী সেঃ স্থির রাখতে হবে। অতিরিক্ত তাপমাত্রায় এর গরমের ধকলে ভোগবে। এতে ডিম উৎপাদন মারাত্মকভাবেহ্রাস পাবে।

২. আলো ঃ কোয়েলের ডিম উৎপাদন আলোর ওপর যথেষ্ট নির্ভরশীল । তাই কোয়েল থেকে পর্যাপ্ত ডিম পেতে হলে দৈনিক ১৬ ঘন্টা আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। এই লক্ষ্যে ষষ্ঠ সপ্তাহে ১৩ ঘন্টা আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। সপ্তম ,অষ্টম ও নবম সপ্তাহে সপ্তাহপ্রতি এক ঘন্টা হিসেবে বাড়তি তা যথাক্রমে ১৪.১৫, ও ১৬ ঘন্টার বৃদ্ধি করতে হবে। নবম সপ্তাহ থেকে বাকি সময় প্রতিদিন এই ১৬ ঘন্টা হিসেবেই আলো বরাদ্দ করতে হবে। উলেখ্য একটি ৪০ ওয়াটের বাল্ব দিয়ে (মিটার জায়গা আলোকিত করা যায়। ডিম উৎপদনে আলোর বর্নের ও প্রভাব রয়েছে। পর্যাপ্ত ডিম উৎপাদনে লাল বর্নের আলো থেকে বেশি ভূমিকা রাখে।

৩. বায়ু চলাচল ব্যবস্থা ঃ ঘরে পর্যাপ্ত বায়ূ চলাচল ব্যবস্থা থাকতে হবে। বড় খামারে ক্ষেত্রে বায়ূ চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য, ঘরের লিটার শুকানোর জন্য এক্সাস্ট পাখা লাগাতে হবে। ঘরের আপেক্ষিক আর্দ্রতা থাকতে হবে ৫৫-৬০%।

৪. প্রয়োজনীয় জায়গা ঃ লিটার পদ্ধতিতে প্রতিটি পাখির জন্য ২০০-২৫০ বর্গ সে.মি. জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া ঘরের লিটার ১০ সে.মি. পুরু হওয়া বাঞ্ছনীয়। ব্যাটারি পদ্ধতিতে খাঁচা ছোট হোক বা বড় হোক একতলা হোক বা ছয়তলা হোক অবশ্যই প্রতিটি কোয়েলের জন্য ১৫০ -২০০ বর্গ সে.মি. জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। উভয় পদ্ধতিতেই ব্রিডার কোয়েলের জন্য কিছুটা বেশি জায়গার প্রয়োজন হবে।

৫. ডিম পাড়ার বাক্স ঃ লিটার পদ্ধতিতে কোয়েল পালনে একটি অসুবিধা হলো, এরা ডিম পাড়ার পর পরই অনেক সময়ই তা লিটারের ভেতরে লুকিয়ে ফেলে। তাছাড়া লিটারে পাড়া ডিমে অহরহই ময়লা লেগে যায়। এতে ডিম দেখতে খারাপ লাগে। তাই লিটারে পালিত কোয়েলের ক্ষেত্রে ডিম পাড়ার বাক্স ডিম পাড়ানোর অভ্যাস করা উচিত। এ লক্ষ্যে লেয়ার হাউজে কোয়েলের সংখ্যার অনুপাতে ডিম পাড়ার বাসা বা লেয়িং নেস্ট সরবরাহ করা উচিত। প্রতি ৪-৫ টি কোয়েলের জন্য একটি লেয়িং নেস্ট সরবরাহ করা উচিত। প্রতিটি লেয়িং নেস্ট ১৫x ২০ x ২০ ঘন সে.মি. মাপের হওয়া বাঞ্ছনীয় ।

৬. খাদ্য ও পানির জায়গা ঃ ব্যাটারি বা লিটার উভয় পদ্ধতিতেই প্রতিটি কোয়েলের জন্য খাদ্য ও পানির জন্য যথাক্রমে ৩ ও ২ সে.মি. জাগয়া বরাদ্দ করতে হবে। তাছাড়া বিশেষ নকশার খাদ্য ও পনির পাত্র ব্যবহার করতে হবে। এতে খাদ্য ও পানির অপচয় রোধ হবে।

৭. স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ ঃ খামার সব সময় স্বাস্থ্যসম্মত ও জীবানুমুক্ত রাখতে হবে । এতে কোয়েল থেকে পর্যাপ্ত উৎপাদন পাওয়া যাবে।

১৩.৩ বিভিন্ন বয়সের কোয়েলের খাদ্যঃ

কোয়েলের পালনকালের বিভিন্ন পর্যায়ে স্বাভাবিক বৃদ্ধি স্বাস্থ্যরক্ষা ,ডিম ও মাংস উৎপাদনের জন্য এদের খাদ্যে বিভিন্ন পুষ্টি মান উপাদানের চাহিদার বেশ তারতম্য ঘটে। পুষ্টি উপাদানের চাহিদার ওপর ভিত্তি কওে বয়স অনুযায়ী কোয়েলকে বিভিন্ন শ্রেনীতে ভাগ করা হয়। ১. প্রারম্ভিক পর্ব, ২. বৃদ্ধি পর্ব, ৩. ডিম পাড়া পর্ব,

৪. ব্রিডার পর্ব

১. প্রারম্ভিক পর্ব ঃ জন্মের দিন থেকে তিন সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত কোয়েলের খাদ্যের প্রতি বিশেষ সজর দিতে হয়। কারণ ,এ সময়টা এদের জীবনের সংকটময় কাল । এ বয়সে এদের দৈহিক র্বদ্দির সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে এবং মর্দা ও মাদীর বৃদ্ধির হারও সমান থাকে। প্রারম্ভিক পর্বের কোয়েলের খাদ্যে ২৭ % আমিষ ও প্রায় ২,৮০০ কিলো ক্যালোরি বিপাকীয় শক্তি /কেজি থাকা প্রয়োজন।

২. বৃদ্ধি পর্ব ঃ তিন সপ্তাহের পর থেকে মদ্দাগুলোর তুলনায় মাদীগুলোর বৃদ্ধির হার বেশি হয়। কারণ এ সময় মাদীগুলোর ডিম্বাশয় ও ডিম্বনালীর আকার ও ওজন বাড়তে থাকে। কোয়েল ছাড়া পোল্ট্রিও অন্য প্রজাতিগুলোর মধ্যে এমনটি সচরাচর দেখা যায় না। তবে সামগ্রিকভাবে প্রারম্ভিক পর্বের তুলনায় এ পর্বে কোয়েলের বৃদ্ধির হার কম। এ বয়সের কোয়েলের খাদ্যে ২৪% আমিষ ও ২,৮০০ কিলো ক্যালরি বিপাকীয় শক্তি/কেজি থাকতে হয়। তবে ব্রয়লার কোয়েলের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পর্বের প্রারম্ভিক পর্বের ন্যায় খাদ্যে ২৭% আমিষ থাকা প্রয়োজন।

৩. লেয়ার পর্বের খাদ্য ঃ কোয়েল ছয় সপ্তাহ বয়স থেকে ডিম পাড়া শুরু করে । এ সময় এদের বৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী পর্বগুলির মত এতদূরত হয়না দৈহিকবৃদ্ধি ও ডিম পাড়া হারের উপর ভিত্তিকরে এ পর্বটিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন ঃ (১) ৬-১৪ সপ্তাহ (২) ১৫ -২৬ সপ্তাহ

(৩) ২৭ থেকে বাকি সময় পর্যন্ত । ৬ -১৪ সপ্তাহ পর্যন্ত সময় ডিম উৎপাদন শূন্য থেকে সর্বোচ্চ হারে (৯০%) পৌছে। তাছাড়া ডিমের আকার ওজন বৃদ্ধি পায় । ফলে খাদ্যে সেই মোতাবেক নজরদিতে হয়। ১৫ - ২৬ সপ্তাহ বয়সে দৈহিক বৃদ্ধি এবং ডিমের াআকার ও ওজনের তেমন পরিবর্তন হয় না। কাজেই এই পর্যায়ে পূর্ববর্তী পর্যায় থেকে আমিষ ও বিপাকীয় শক্তি কম লাগে। ২৭ থেকে বাকি সময় ডিম উৎপাদন কমে যায় । তবে ডিমের আকার ও ওজন কিছুটা বৃদ্ধি পায় এই সময় দৈহিক বৃদ্ধি স্থির থাকে বিধায় আমিষ ও বিপাকীয় শক্তি কম লাগে।

৪. ব্রিডার পর্ব ঃ ব্রিডার কোয়েলকে খাদ্য মোরগ-মুরগির মত ব্রিডার রেশন দিতে হয়। এখাদ্য তৈরি করার সময় ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্সও ব্রিডার রেশনের দিতে হয়।

বিভিন্ন বয়সের কোয়েলের খাদ্য তালিকাঃ

উপাদান কেজি/১০০কেজিতে)	প্রারম্ভিক রেশন (০-৩ সপ্তাহ)	বৃদ্ধির /বাড়ন্ত রেশন (৪-৫ সপ্তাহ)	লেয়ার/ ব্রিডার রেশন (৬ সপ্তাহ -বাকী সময়)
ভূট্টা	৫৩.২০	৫৩.২৫	৫০.২৫
মিহি চাউলের কুড়া	১৫.০০	১৬.০০	১৬.০০
প্রোটিন কনসেনট্রেড	৮.০০	৭.০০	৭.০০
সয়াবিন মিল	২১.০০	২০.০০	২০.০০
ঝিনুক চূর্ন	২.০০	৩.০০	৬.০০
লবন	০.৫০	০.৫০	০.৫০
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৩০	০.২৫	০.২৫
সর্বমোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

১৩.৪ কোয়েলের রোগ ব্যাধি ও প্রতিকার এবং কোয়েলের বাজার জাত করন ঃ

কোয়েল পালনের অন্যতম সুবিধা হলো এদের রোগ ব্যাধি কম। এদের রোগ ব্যাধি কম হওয়ায় টীকা দিতে হয় না। অন্যদিকে কৃমির ঔষধ খাওয়াতে হয়না। তবে নিয়মিত ও অধিক হারে মাংস ও ডিম উৎপাদন পেতে হলে খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের সংগে সংগে কোয়েলের রোগ ব্যাধিসম্পর্কে খামারীদের যথাযথ জ্ঞান থাকতে হবে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। এ পর্যন্ত কোয়েলের যে সমস্ত রোগ ব্যাধি সম্পর্কে জানা গেছে তার মধ্যে নিম্ন লিখিত রোগ গুলো অধিক গুরুত্ব পূর্ন।

১. ক্ষতসৃষ্টিকারী তন্ত্র প্রদাহ ,
২. কোয়েলের ক্লোমনালী প্রদাহ,
৩. ব্রুডার নিউমোনিয়া,
৪. কলিসেপ্ টিসিমিয়া
৫. রক্ত আমাশয় এবং
৬. স্পর্শ জনিত চর্মপ্রদাহ

ক্ষতসৃষ্টিকারী তন্ত্র প্রদাহ ঃ

কোয়েলের রোগ ব্যাধির মধ্যে এটি সবচেয়ে মারাত্মক । কারন এ রোগে আক্রান্ত হলে ১০০% ও মারা যেতে পারে। সাধারনত দুষিত খাদ্য দ্রব্য খাওয়ার মাধ্যমে বাচ্চা কোয়েল এ রোগে আক্রান্ত হয়। সাধারনত এটি লিটারে পালিত কোয়েলের বেশি দেখা যায় । এটি ব্যাকটেরিয়া ঘটিত অন্ত্রের রোগ। এই রোগে আক্রান্ত হলে স্থানীয় যে কোন প্রাণিচিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন।

২. কোয়েলের শ্লোমনালী প্রদাহঃ

এক ধরনের ভাইরাসের আক্রমনে কোয়েলের এ রোগ হয়। এতে শ্লোমনালী আক্রান্ত হয়ে তীব্র প্রকৃতির প্রদাহের সৃষ্টি করে। ৩ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত এ রোগটি স্থায়ী হতে পারে এবং বাচ্চা কোয়েলে ৮০% পর্যন্ত মৃত্যু হার হতে পারে। আক্রান্ত কোয়েলে হাঁচি, কাশি ও অস্বাভাবিক শ্বাসীয় শব্দ লক্ষ্য করা যায়। তবে নাক দিয়ে কোন তরল পদার্থ নিঃসৃত হতে দেখা যায় না। কোন কোন সময় চোখ দিয়ে পানি পড়তে দেখা যায়। যেহেতু এটি ভাইরাস জনিত রোগ তাই এর কোন চিকিৎসা নেই। ব্যাকটেরিয়া জনিত মাধ্যমিক সংক্রমন এরাতে স্থানীয় প্রাণিচিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন।

৩. ব্রুডার নিউমোনিয়া ঃ

বাচ্চা মুরগিতে ব্রুডার নিউমোনিয়া সৃষ্টিকারী ছত্রাক অ্যাসপারজিলাস ফিউমিগেটাস বাচ্চা কোয়েলকে আক্রান্ত করতে পারে। দুষিত খাদ্য বা লিটার সামগ্রীর সংস্পর্শে অথবা নিঃশ্বাসের মাধ্যমে দুষিত বস্তু গ্রহনে কোয়েল এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তীব্র প্রকৃতির রোগে ক্ষুধামান্দ্য, পিপাসা বৃদ্ধি, জ্বর ও শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। বাচ্চা শুকিয়ে যায় ও দুর্বল হয়ে পড়ে। শ্বাসকষ্টের কারণে বাচ্চা মুখ হা করে ঘাড় মাথা উপরের দিকে টান করে শ্বাস গ্রহন করে।

৪. **কলিসেপটিসিমিয়া ঃ**

ইসকেরিশিয়া কোলাই নামক ব্যাকটেরিয়া এ রোগ সৃষ্টি করে। বাচ্চা এবং বয়স্ক সব বয়সের কোয়েলই এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এতে সচরাচর শ্বাসতন্ত্র আক্রান্ত হলেও অন্যান্য তন্ত্র ও আক্রান্ত হতে পারে। সাধারনত রোগ লক্ষণ প্রাকাশের পূর্বেই পাখির মৃত্যু ঘটে। হঠাৎ পাখির মৃত্যু হার বেড়ে যায় এবং শ্বাসতন্ত্রের উপসর্গ , মুখ হা করে থাকা, নাকে মুখে ফেনা ওঠা, চোখদিয়ে পানি পড়া
ইত্যাদি দেখা যায়।

৫. রক্ত আমশয় ঃ

মুরগিতে রক্ত আমাশয় সৃষ্টিকারী এককোষী পরজীবিগুলো কোয়েলকে আক্রান্ত করে না। তবে আইমেরিয়া উজুরা ও আইমেরিয়া সুনোডাই নামক এককোষী পরজীবি বাচ্চা কোয়েলকে আক্রান্ত করে। এতে রক্ত আমাশয় দেখা দেয়। বাচ্চা ঝিমাতে থাকে ,দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং রক্ত শূন্যতার কারনে মারা যায়।

৬. স্পর্শজনিত চর্মপ্রদাহ ঃ

লিটার ও খাঁচা পদ্ধতিতে পালিত কোয়েলে প্রায় সময়ই এ রোগটি দেখা যায়। সাধারনথ ৩/4 মাস বা ততোধিক বয়সের কোয়েল আক্রান্ত হয়। এতে মর্দা কোয়েলের প্রজনন ক্ষমতা ও মাদী কোয়েলের ডিম উৎপাদন মারাত্মক ভাবে হ্রাস পায়। কাজেই কোয়েল খামারিদের এ রোগ সম্পর্কে জ্ঞান রাখা অত্যন্ত জরুরি। কয়েকটি চর্মরোগ যেমন - হক বার্ন ,ব্রেস্ট বিষ্টার, স্কেবি হিপ সিড্রোম ইত্যাদি ।